ই-গভর্নেন্স | তথ্যপ্রযুক্তি | উদ্ভাবন

রূপান্তরের বাংলাদেশ

বিশ্বজুড়ে নীরবে বা সরবে একটা বিপ্লব চলছে। গত তিন দশক ধরে তথ্যপ্রযুক্তি এই বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। বদলে দিচ্ছে সরকারি কাজের পদ্ধতি আর নাগরিক সেবার ধরন। এই পরিবর্তনের একেবারে কেন্দ্রে আছে ই-গভর্নেন্সের ধারণা। ই-গভর্নেন্স মানে হলো সরকারি কার্যক্রম এবং নাগরিক সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা বাড়ে, কাজ দ্রুত হয়, আর সেবা সহজে পাওয়া যায়। ই-গভর্নেন্স শুধু তথ্য দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি আসলে পুরো শাসন ব্যবস্থাকেই আধুনিক করার একটা প্রক্রিয়া। এটি সরকারের কাজের ধরন এবং নাগরিকদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার পদ্ধতিতেও রূপান্তর ঘটায়। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ধাপে ধাপে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমুখী ভূমিকা রাখে।

ই-গভর্নেন্স শুধু এই নয় যে আগের নিয়মেই কাজ হবে, শুধু সেটা কম্পিউটারে করা হবে; বরং এটা আসলে শাসনব্যবস্থাকে নতুন করে ভাবা, যেখানে নাগরিক থাকবে সবার আগে, আর যেকোনো জায়গা থেকেই, যেকোনো পরিস্থিতিতে, সহজেই দরকারি সেবা পাবে। ই-গভর্নেন্স এমন একটা ব্যবস্থা, যাতে নাগরিকরা সরকারের সাথে খুব সহজে যোগাযোগ করতে পারবে, সময় বাঁচবে, আর কোনো ঝামেলা ছাড়াই সেবা নিতে পারবে।

ই-গভর্নেন্স

তথ্যপ্রযুক্তির হাত ধরে জীবনযাত্রায় বড় পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, বদলে দিচ্ছে সরকারের কাজ ও সেবা দেওয়ার ধরনও। আগে সরকারি অফিসে একটা কাজ করতে গেলে কত ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হত, কত অফিস ঘুরতে হত। এখন অনেক সেবাই অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে, ঘরে বসেই করা যায় আবেদন। ফলে সাশ্রয় হয় সময়, খরচ ও পরিশ্রম। এই যে পরিবর্তন, এটা তথ্যপ্রযুক্তির কারণে সম্ভব হয়েছে। গত শতকের আশির দশক থেকে এই পরিবর্তন আরও গতি পেয়েছে, যখন মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা সরকারের কাছে আরও ভালো সেবার দাবি জানাতে শুরু করেছে। সরকার নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেছে কীভাবে আরও ভালো ও দ্রুত সেবা দেওয়া যায়। এই চিন্তাভাবনার ফলেই ই-গভর্নেন্সের ধারণা জন্ম নিয়েছে। তবে শুধু ই-গভর্নেন্সের ধারণা থাকলেই হবে না, এটাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে একটা 'উদ্ভাবনী সংস্কৃতি' গড়ে তোলা খুব জরুরি। এই উদ্ভাবনী সংস্কৃতিই হচ্ছে ই-গভর্নেন্সের প্রাণ।

গত শতকের আশির দশক থেকে এই পরিবর্তন আরও গতি পেয়েছে, যখন মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা সরকারের কাছে আরও ভালো সেবার দাবি জানাতে শুরু করেছে। সরকার নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেছে কীভাবে আরও ভালো ও দ্রুত সেবা দেওয়া যায়। এই চিন্তাভাবনার ফলেই ই-গভর্নেন্সের ধারণা জন্ম নিয়েছে।

এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে প্রশাসনকে আরও দক্ষ হতে হবে, মানুষের প্রয়োজন বুঝতে হবে, আর সে অনুযায়ী সেবা দিতে হবে। শুধু নতুন ভবন বা অন্যান্য অবকাঠামো তৈরি করলেই হবে না, প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদেরও সেই নতুন পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়াতে হবে, তাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। তাই প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই জরুরি। আর এজন্য নতুন নতুন কৌশল উন্নয়ন করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। সেবাদানের পুরোনো দর্শন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে ভাবতে হয়েছিল। এই সময় তথ্যপ্রযুক্তি একটা বড় নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। তথ্যপ্রযুক্তি শুধু একটা সরঞ্জাম নয়, এটা আসলে একটা নতুন চিন্তাভাবনা, একটা নতুন সংস্কৃতি।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ই-গভর্নেন্সের ধারণা এখনও বেশ নতুন। এইসব দেশে সরকারি সেবা পেতে গেলে অনেক সমস্যা হয়, যেমন দেরি হওয়া, আর্থিক অনিয়ম, আর ঠিকমতো সেবা না পাওয়া। ই-গভর্নেন্স দিয়ে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়। কিন্তু এর জন্য দরকার নতুন কিছু ভাবার মানসিকতা আর নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার ইচ্ছা।

অনেক মানুষ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়, তাদের জন্য ই-গভর্নেন্সের সুবিধা বুঝতে আর ব্যবহার করতে সময় লাগতে পারে। তাই প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ তৈরি করাও খুব জরুরি। শুধু প্রযুক্তি দিলেই হবে না, মানুষকে সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

ই-গভর্নেন্সের পুরো ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে 'উদ্ভাবনের সংস্কৃতি'। বড় বড় কোম্পানি আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক দিন ধরেই তাদের সেবা ও পণ্য বিক্রির জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি বের করে, কিন্তু সরকারি অফিসে এই ব্যাপারটা খুব বেশি দিন হয়নি। আশির দশকে 'নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট' (এনপিএম) নামে একটা নতুন ধারণা আসে, তখন থেকেই সরকারি অফিসে এই নতুন কিছু করার প্রচলন শুরু হয়। এর লক্ষ্য হলো, সরকারি কাজকর্ম আরও দক্ষ, আরও কার্যকর ও কম খরচে করতে হবে। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের কাজকর্মের ধরন বদলাতে চেষ্টা করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশই এই পরিবর্তনের পথে হাঁটা শুরু করেছে।

তবে, ই-গভর্নেন্সের পথটা সহজ ছিল না। প্রথম দিকে, সব দেশের কাছে প্রযুক্তি ছিল না। ধনী দেশগুলো যেমন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছিল, গরিব দেশগুলো অনেক পিছিয়ে ছিল। এই 'ডিজিটাল বৈষম্য' একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাতিসংঘ এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এগিয়ে আসে। তারা বলে, ই-গভর্নেন্স দিয়ে এই বৈষম্য কমানো যায়, প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবাইকে সুবিধা দেওয়া যায়।

জাতিসংঘ শুধু সেবা দেওয়ার জন্য নয়, বরং মানুষের অধিকার আর সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যও ই-গভর্নেন্সকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে দেখেছিল।

২০০০ সালে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) ঘোষণা করে জাতিসংঘ। এতে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসন ও দক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলায় জোর দেওয়া হয়।

অনেক মানুষ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়, তাদের জন্য ই-গভর্নেন্সের সুবিধা বুঝতে আর ব্যবহার করতে সময় লাগতে পারে। তাই প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ তৈরি করাও খুব জরুরি। শুধু প্রযুক্তি দিলেই হবে না, মানুষকে সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

পরের বছর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ‘ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি’ (ডব্লিউএসআইএস) আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিলে, বাংলাদেশও তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় আইসিটি নীতি প্রণয়ন এবং আইসিটি টাস্ক ফোর্স গঠনের উদ্যোগ নেয়। যেটি বাস্তবায়ন শুরু হয় পরের বছরে।

২০০৩ সালে জেনেভায় ডব্লিউএসআইএস-এর প্রথম ধাপের সম্মেলনে বাংলাদেশ ১১-দফা এজেন্ডা সমর্থন করার পরপরই দেশে আইসিটি খাতে উন্নয়নের উদ্যোগ শুরু হয়। অন্যদিকে ডব্লিউএসআইএস এর সিদ্ধান্তের আলোকে এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে ২০০৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সরকারি সেবায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনতে ‘ই-গভর্নেন্স’ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়। এরই প্রেক্ষিতে ওই বছরই বিভিন্ন দেশে সরকারি দপ্তরে প্রযুক্তির ব্যবহার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়।

২০০৫ সালে তিউনিশিয়ায় জাতিসংঘের ডব্লিউএসআইএস সম্মেলনের আগেই ২০০৩ সালে সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স (এসআইসিটি) প্রকল্পের সহযোগিতায় বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম শুরু হয়।

২০০৬ সালে ইউএনডিপির সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ‘একসেস টু ইনফরমেশন’ (এটুআই) প্রোগ্রামের যাত্রা শুরু হয়। এটুআই প্রায় দুই দশক ধরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। শুধু প্রযুক্তিগত সহায়তাই নয়, এটুআই সরকারি অফিসগুলোতে নতুন কিছু করার একটা সংস্কৃতিও তৈরি করেছে। এই পরিবর্তন এখনও চলছে, যেখানে নতুন আর পুরোনো প্রজন্মের সরকারি কর্মচারীরা একসাথে কাজ করছে। এই ‘নতুন কিছু করার সংস্কৃতি’ শুধু নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করাই নয়, বরং পুরোনো নিয়ম ভেঙে নতুন তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরি করা, যা মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

২০০৫ সালে তিউনিশিয়ায় জাতিসংঘের ডব্লিউএসআইএস সম্মেলনের আগেই ২০০৩ সালে সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্কফোর্স (এসআইসিটি) প্রকল্পের সহযোগিতায় বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম শুরু হয়।

চিত্র ক: একনজরে ই-গভর্নেন্স

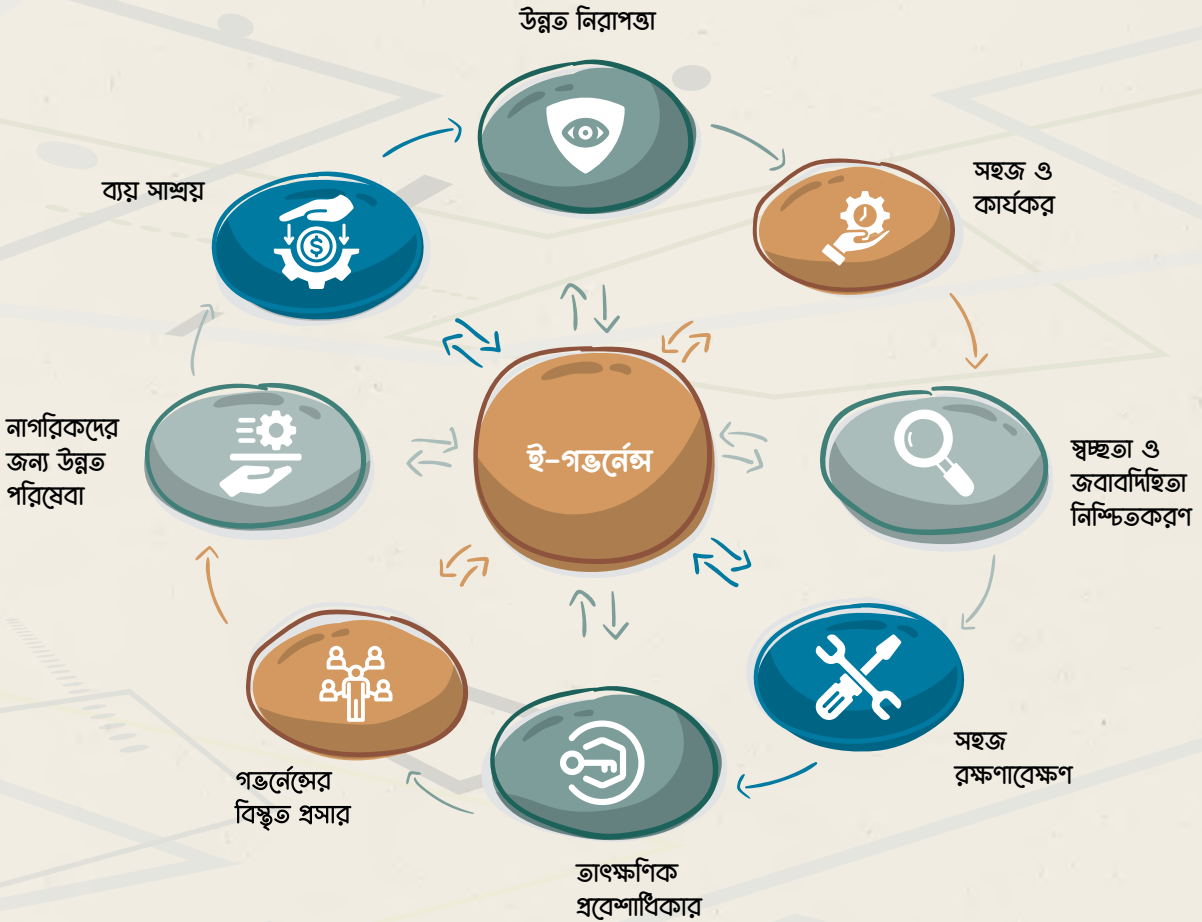

সূত্র: রিভ সিস্টেম, (এন.ডি)। *রেজাল্ট ড্রিভেন রোডম্যাপ ফর গভর্নমেন্ট আইটি প্রজেক্টস।*

এটুআই প্রায় দুই দশক ধরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। শুধু প্রযুক্তিগত সহায়তাই নয়, এটুআই সরকারি অফিস সমূহে নতুন কিছু করার একটা সংস্কৃতিও তৈরি করেছে। এই পরিবর্তন এখনও চলছে, যেখানে নতুন আর পুরোনো প্রজন্মের সরকারি কর্মচারীরা একসাথে কাজ করছে।

বাংলাদেশেও ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সরকার অনেক মন্ত্রণালয় আর বিভাগে অনলাইন সেবা চালু করেছে। এখন জমির রেকর্ড ডিজিটাইজ করা হচ্ছে, যাতে মানুষ সহজেই জমির তথ্য পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ই-নামজারি' ব্যবস্থার কথা বলা যায়।

> ২০১৯ সাল পর্যন্তও জমি নামজারি করতে গেলে মানুষকে অফিসে অফিসে ঘুরতে হতো, অনেক সময় লাগত, এমনকি আর্থিক অনিয়মও হত। এখন ই-নামজারির মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যায়, ফলে সময় ও ভোগান্তি অনেক কমেছে। অনলাইনে ট্যাক্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে মানুষ ঘরে বসেই ট্যাক্স দিতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্যও অনলাইনে আবেদন করা যায়।

'মাইগভ'-এর মাধ্যমে অনেক সরকারি সেবা এক জায়গায় পাওয়া যায়। কৃষকদের জন্য 'কৃষি তথ্য সার্ভিস' চালু করা হয়েছে, যেখানে তারা কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য 'ই-লার্নিং'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা অনলাইনে পড়াশোনা করতে পারে। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি। ই-গভর্নেন্সকে সফল করতে হলে আরও বেশি নতুন কিছু করতে হবে আর জনগণের সাহায্য দরকার। সরকারকে আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে, যাতে প্রযুক্তি সবার কাছে পৌঁছায় এবং মানুষ এর সুবিধা নিতে পারে। কিন্তু এর জন্য দরকার নতুন কিছু ভাবার মানসিকতা, প্রযুক্তি ব্যবহার করার দক্ষতার পাশাপাশি জনগণের সাহায্য।

বাংলাদেশের ই-গভর্নেন্স যাত্রায় ইউএনডিপি ছাড়া আরও অনেক সংস্থা সহায়তা দিয়েছে, যেমন গেটস ফাউন্ডেশন, ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, আইএলও, বিশ্ব ব্যাংক, ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপি, গিভ ডিরেক্টলি, ইউএসএআইডি, অ্যাকশনএইড, মেটা (ফেসবুক) সহ আরও অনেক।

তবে ই-গভর্নেন্সকে সফল করতে হলে শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার করলেই হবে না, সরকারি দপ্তরে একটা উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলা খুবই জরুরি। এই উদ্ভাবনী সংস্কৃতি কীভাবে কাজ করে? এটা আসলে একটা মানসিকতা, যেখানে কর্মচারীরা নতুন কিছু করতে, নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজতে উৎসাহী হয়। তারা পুরোনো নিয়ম ভেঙে নতুন নিয়ম তৈরি করতে ভয় পায় না, বরং নতুন কিছু চেষ্টা করতে প্রস্তুত থাকে। এই ধরনের মানসিকতা থাকলেই ই-গভর্নেন্সের সুফল পাওয়া যায়। যেমন, যদি কোনো সরকারি অফিসে নতুন একটা সফটওয়্যার চালু হয়, আর কর্মচারীরা সেই সফটওয়্যার ব্যবহার করে আরও ভালো সেবা দেওয়ার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি বের করে, তাহলেই সেই সফটওয়্যার আসলেই কাজে লাগবে।

এই বইয়ে আমরা দেখব কীভাবে ই-গভর্নেন্স আর নতুন কিছু করার সংস্কৃতি মিলেমিশে বাংলাদেশের সরকারি সেবাকে বদলে দিচ্ছে। আমরা বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানব, কী কী সমস্যা হয়েছিল, আর কীভাবে সেগুলো সমাধান করা হয়েছিল সেগুলো আলোচনা করব। প্রাসঙ্গিকভাবেই ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে বৈশ্বিক বিভিন্ন সূচকের শীর্ষে থাকা দেশগুলোর উদাহরণ টেনে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে বাংলাদেশের সক্ষমতা, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পথরেখা। এই বই শুধু বাংলাদেশের ই-গভর্নেন্স যাত্রার একটা কাহিনি নয়; এটা একটা আহ্বান, আরও নতুন কিছু করার জন্য, আরও বেশি মিলেমিশে কাজ করার জন্য, যাতে একটা সত্যিকারের তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর নাগরিক-কেন্দ্রিক সরকারি সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

ই-গভর্নেন্সকে সফল করতে হলে শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার করলেই হবে না, সরকারি দপ্তরে একটা উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলাও খুব জরুরি। এই উদ্ভাবনী সংস্কৃতি কীভাবে কাজ করে? এটা আসলে একটা মানসিকতা, যেখানে কর্মচারীরা নতুন কিছু করতে, নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজতে উৎসাহী হয়।

সূচিপত্র

১৩ **উদ্ভাবন সংস্কৃতি: ই-গভর্নেন্স**

ই-গভর্নেন্সের বিবর্তন এবং এর মাধ্যমে সরকারি সেবার আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে সরকারি সেবা আরও সহজলভ্য, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করা যায় তা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

৩৩ **রূপান্তরের অনুঘটক**

২০০১ সাল থেকে শুরু করে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারি সেবাগুলোকে প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব করা হয়েছে। বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের পথপরিক্রমা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

৫৭ **রূপান্তরের দৃশ্যকল্প**

এই অধ্যায়ে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে নাগরিক সেবায় রূপান্তরের বিভিন্ন উদাহরণ এবং উদ্যোগ তুলে ধরা হয়েছে। ই-পাসপোর্ট, ই-মিউটেশন, মাইগভ, ডি-নথি, ডিজিটাল সেন্টারসহ বিভিন্ন সেবা নাগরিক জীবনকে সহজ ও দ্রুত করেছে।

৮৭ **সম্ভাবিকাশ ও উন্নয়ন**

এই অধ্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তি, এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি এবং ডিজিটাল বিভাজনের চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

১০১ রূপান্তরের বিশ্বমঞ্চে

এই অধ্যায়ে তিনটি আন্তর্জাতিক সূচকের মাধ্যমে বাংলাদেশের ই-গভর্নেন্সের অগ্রগতি উঠে এসেছে। তবে, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করার ক্ষেত্রে আরও উন্নতির প্রয়োজন।

১০৬ তুলনা মূলক নাকি অমূলক?

জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে উন্নয়নের বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

১১৭ উদ্ভাবনে আন্তর্জাতিক অর্জন

বাংলাদেশ ই-গভর্নেন্সে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে, যা আন্তর্জাতিক সূচকে প্রমাণিত। সাউথ সাউথ কো-অপারেশনের মাধ্যমে অন্যান্য দেশকে সহায়তা করছে এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য প্রশংসিত হচ্ছে।

১২৩ রূপান্তরের দিগন্তে

ই-গভর্নেন্সের প্রভাবে ডিজিটাল বিভাজন তৈরি হলেও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিপিআই-এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ চলছে। ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনের সংস্কৃতি তৈরিতে সচেষ্ট সরকার।

The Journey of a2i in Bangladesh

2002

- Formulation of the National ICT Policy
- Formation of the ICT Task Force

2003

Launch of the 'Support to ICT Task Force (SICT)' Project

2004-05

- Formulation of the e-Governance Action Plan and Publication of 50 government forms online
- Launch of the 'Strengthening ICT Capacity of Prime Minister's Office' project

2006

- Issuance of the e-Governance 'Plan of Action'
- Establishment of the e-Governance Cell
- Formation and approval of the Access to Information (a2i) Project

2007

- e-Governance Horizon Scan Report
- Community e-Center (Piloting)
- 60+ Stakeholder Consultation Meeting

2008

- DC Office Website / District Web Portal (Piloting)
- Union Information and Service Center (UISC)
- Agriculture and Fisheries Information and Community Center

2009

- District Web Portal
- e-Purji – SMS-based Purji System
- Utility Bill e-Payment Guidelines
- First e-Service Training for UNOs and DCs

2010

- 4501 Union Information and Service Centers
- 700 Quick Wins
- m-Ticketing

2011

- e-Porcha
- 64 District e-Service Centers
- e-Information Database

2012

- National e-Service System (NESS)
- Retired Teachers Welfare Management System
- Bangla SMS
- Citizen Core Data Structure Guidelines
- Digital Land Record System (DLSR) for 64 DC Offices

2013

- Future of Education
- Teachers' Portal
- Multimedia Classroom Monitoring System (MMCM)
- ICT Service in Education Master Plan
- Service Innovation Fund

2014

- National Information Portal Framework (NIPF)
- Open Government Data (OGD) Portal
- Empathy Training or Innovative Approach
- Multimedia Talking Book
- Secretariat Instructions – Digital Office Management

2015

- Online Integrated Service Framework (OISF)
- Land Information and Services Framework (LISF)
- Idea Bank
- 10-digit Unique ID for Citizens
- Google Street View
- Grievance Redress System Guidelines
- Online Khatian System
- Time Cost and Visit (TCV)

2016

- e-Filing Management System - Nothi
- Muktopaath
- e-Mobile Court
- Digital Financial Inclusion and Agent Banking
- e-Participation
- Environment Clearance Certificate System
- Inheritance Calculator

2017

- Judicial Portal
- Service Process Simplification (SPS)
- e-Mutation System for Land
- Online Police Clearance Certificate System
- RS-Khatian and Land Records Management System
- South-South Network for Public Service Innovation
- SDG Tracker

2018

- National Helpline 3 3
- Kishore Batayan (Konnect)
- Krishi Batayan
- ekSheba Uddokta
- Expatriate Digital Centre
- CMSME Hube-Challan
- Accessible Dictionary
- Online Social Security Allowance
- ata Driven Decision Making (D3M) Initiative

2019

- NISE3
- Grievance Redress System (GRS)
- ekPay (Payment)
- Centralized Nebulizer System
- Integrated Service Delivery Platform (ISDP)

2020

- MyGov - All Government Services at One Place
- COVID-19 Dashboard
- Corona Info Portal
- e-Port Management System
- My Constituency
- Google Flood Forecasting

2021

- Digital Flood Forecast Warning System in Partnership with Google
- Data Leadership
- Unified Business Identification (UBID)
- Digital Haat

2022

- e-Causelist
- Amar Adalat (MyCourt) App
- SAATHI Network Health Data Architecture
- Digital Service and Web Designing
- Guidelines for Inclusive Accessibility

2023

- Skills Fusion Centre
- Pregnancy Monitoring System
- Structured Patient Referral System
- Expatriate Help Desk
- Strengthening Public Data Systems for Sanitation in Bangladesh (SPDSSB)

2024

- e-Apostille
- Hospital Management System
- Vaccination Management System
- National Dashboard

2025

- Nagorik Sheba
- D-toll
- National Portal Framework 2.0
- e-ticketing (mygov)

উদ্ভাবন সংস্কৃতি: ই-গভর্নেন্স

তথ্যপ্রযুক্তিতে উদ্ভাবন নাগরিকদের মধ্যে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'র দর্শনকে আরও প্রবল করে তোলে গত শতকের আশির দশকে। এ দর্শনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নাগরিকদের অধিকার সচেতনতায় নতুন মাত্রা যোগ করে। পাশাপাশি নাগরিকদের চাহিদা অনুযায়ী সেবাদানে প্রচলিত ব্যবস্থাপনার নানা সংকট বিভিন্ন দেশের সরকার উপলব্ধি করতে শুরু করে।

গতিশীল এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশাসনিক সেবা ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সেবাদানে সব দেশেরই নতুন করে ভাবতে হচ্ছিল। অবকাঠামোগত সংস্কারের সঙ্গে প্রশাসনের সক্ষমতা তৈরি করতে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ছাড়া বিকল্প ছিল না। সেবাদানের দর্শনে আনতে হয় পরিবর্তন। সরকারি দপ্তরের সেবাদানের নানা পদ্ধতি উদ্ভাবনের এই যাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তির সংযুক্তি।

'ই-গভর্নেন্স'-এর ক্ষেত্রে 'উদ্ভাবন' বলতে কোনো সেবাকাঠামো সহজতর করার তথ্যপ্রযুক্তিগত প্রয়োগকে বোঝায়। আর এই সংযুক্তিতে পরিবর্তিত হয় ব্যবস্থাপনাও। ধারাবাহিক এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি বাধাহীনভাবে চলার জন্য 'ইকোসিস্টেম' গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়।

সংস্কৃতি থেকেই উদ্ভাবনের শুরু

> নিরেট পাথরের পাহাড় থেকেই পাথরের জোগান নিতে হয়, তবে তার আগে কাউকে একটি ক্যাথেড্রাল বানানোর পরিকল্পনা করতে হয়।

অন্তোয়ানে দ্যু সান এক্সিপেরি, বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস ‘ছোট রাজপুত্র’-এর লেখক।

‘উদ্ভাবনের সংস্কৃতি’ ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তাকে বুঝাতে গিয়ে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ‘দ্য ইউজডম অব স্যান্ডস’ গ্রন্থে লেখক এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

> যথেষ্ট উদ্যোগ ভেস্তে যাবার পরই একটি নতুন উদ্যোগ সফল হতে পারে।

ইলন মাস্ক, আলোচিত উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্স, এক্স এবং টেসলার প্রধান।

স্পেস এক্স চালুর পর ২০০৫ সালে ‘ফাস্ট কোম্পানি’র প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ইলন মাস্কের উক্তিটি প্রকাশিত হয়।

“সরকারি খাতে উদ্ভাবন শুধু যন্ত্র বা চমকপ্রদ জিনিসপত্র নিয়ে নয়; বরং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এবং উন্নত সেবা প্রদানে সৃজনশীল উপায় খুঁজে বের করা।”

জেফ মুলগান, সাবেক প্রধান, ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য আর্টস (এনইএসটিএ), যুক্তরাজ্য।

জেফ মূলগানের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ‘হোল অব গভর্নমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড অ্যাকশন’ নিবন্ধে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

“নতুন কিছু উদ্ভাবনের সময় ভুল হতেই পারে। সেগুলো দ্রুত স্বীকার করে নিয়ে অন্যান্য উদ্ভাবনগুলোকে উন্নত করার কাজে এগিয়ে যাওয়া উচিত।”

স্টিভ জবস, সহ-প্রতিষ্ঠাতা, অ্যাপল।

জেফরি ইয়াং-এর লেখা ২০০৯ সালে প্রকাশিত ‘দ্য জার্নি ইজ দ্য রিওয়ার্ড’ গ্রন্থে তার এই উদ্ধৃতিটি রয়েছে।

বিকাশের পর্যায়

উন্নয়নশীল দেশে উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকাশ খুব একটা সহজ নয়। সম্পদের স্বল্পতার কারণে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশে প্রযুক্তিভিত্তিক অবকাঠামো, কানেক্টিভিটি এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে রূপান্তর জটিল ও সময়সাপেক্ষ। ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রশাসন কাঠামো, আইন এবং নীতিমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মনোভাব পরিবর্তনও কষ্টসাধ্য।

প্রযুক্তি বিষয়ে জনগণের শিক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা এবং বিগ ডাটা ব্যবস্থাপনা যৌথভাবে ই-গভর্নেন্সকে কার্যকর করে তোলে। পাশাপাশি, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি সরকারের উদ্ভাবন প্রক্রিয়া তথা সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

> ই-গভর্নেন্স সরকার, নাগরিক এবং অংশীজনের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির সংস্কৃতি তৈরি করে। শুধু প্রশাসনিক কাঠামো নয়, বরং একটি সৃজনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের ভিত্তিও গড়ে তোলে।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগে আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ই-গভর্নেন্স সরকারি কার্যক্রম ও অংশীজনের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ঘটায়। প্রাথমিকভাবে ই-গভর্নেন্স জিটুসি (গভর্নমেন্ট টু সিটিজেন), জিটুবি (গভর্নমেন্ট টু বিজনেস) জিটুই (গভর্নমেন্ট টু এমপ্লয়িজ), জিটুজি (গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট)– এই চার ধরনের অংশীজনের জন্য কাজের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। সরকারি সেবা স্বচ্ছ, দ্রুত ও সাশ্রয়ীভাবে দিতে এবং কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ই-গভর্নেন্স জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজন বিবেচনা করে। সেই অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের মাধ্যমে নাগরিক, ব্যবসায়ী, কর্মচারী এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ায়।

চিত্র ১.১: ই-গভর্নেন্সের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

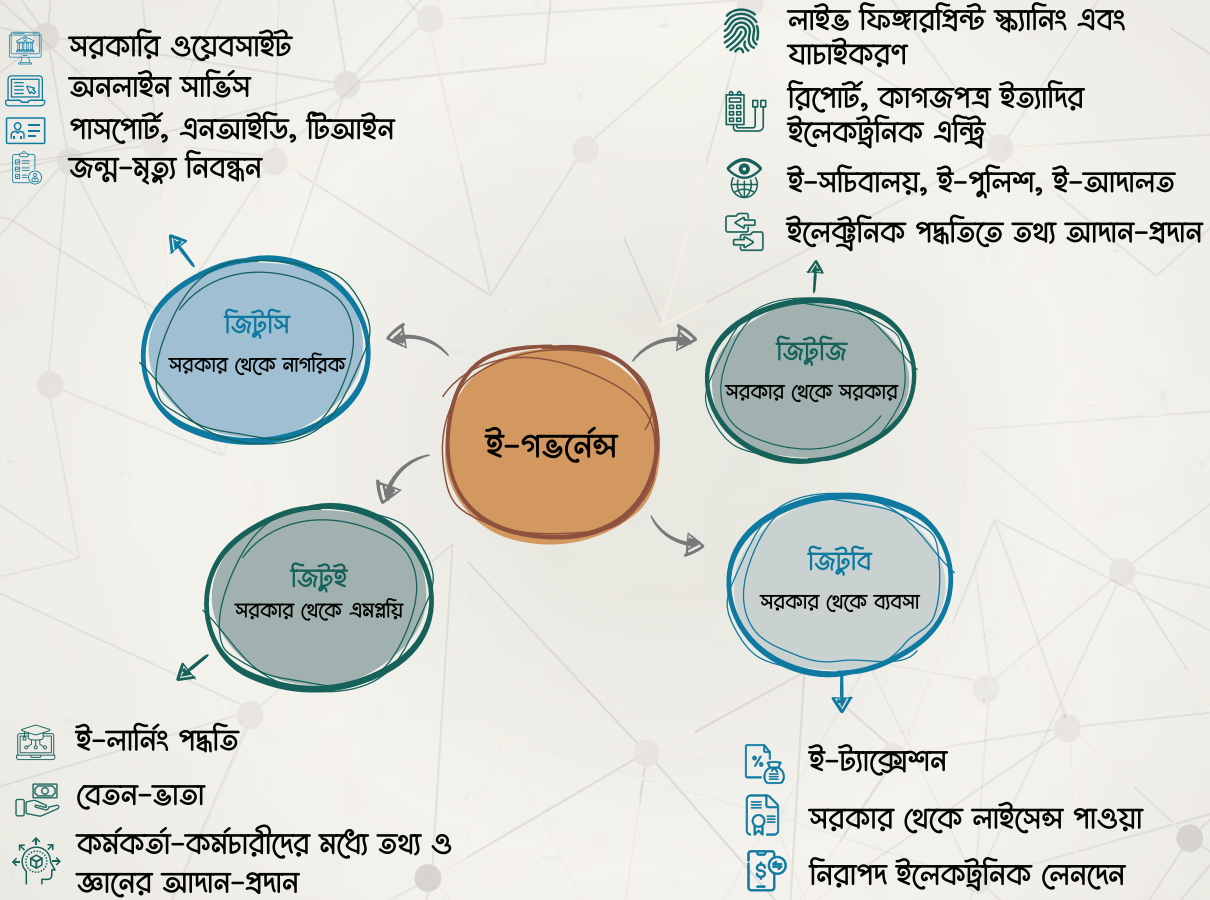

সূত্র: নিয়াজী, কিউ.এ., আলিয়াস, টি., আলগামদি, টি., এট এল, (২০২৪)। *রিডিফাইনিং গভর্নেন্স: এ ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অব সাসটেইনেবিলিটি ট্রান্সফরমেশন ইন ই-গভর্নেন্স*। রিসার্চগেট। (অনুপ্রাণিত)

জিটুসিতে নাগরিককে প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা, তথ্য এবং সুবিধা সরকার সরাসরি পৌঁছে দেয়া। প্রয়োজনীয় সরকারি সেবা নাগরিকেরা কীভাবে পেতে পারেন সেই তথ্য অনলাইনে জানানোর মধ্য দিয়ে ২০০৪ সালে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে জিটুসি যাত্রা। প্রায় দুই দশকে উদ্ভাবনের নানা পথ পেরিয়ে আজ কেবল তথ্য নয়, নাগরিকের প্রয়োজনীয় অনেক সেবা বা তথ্য সরাসরি অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে।

উদ্ভাবনের নিরন্তর প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ও জটিলতা কাটিয়ে দিনদিন তা সহজ করার প্রক্রিয়াও চলছে। আজকে যে নাগরিক জন্ম নিচ্ছেন তার জন্মনিবন্ধন থেকে শুরু করে জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, শিক্ষা, ভূমিসেবাসহ রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য প্রায় সকল তথ্য ও সেবাই রয়েছে অনলাইনে।

জিটুসি সরকারি সেবাকে আরও সহজলভ্য, সুবিধাজনক এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক করে তুলছে। উদাহরণ হিসেবে রেলের ই-টিকেটিং-এর কথা বলা যায়। ঈদের সময় রেলের টিকেটের ওপর চাপ থাকে। অসাধু ব্যবসায়ীরা রেলের টিকেট কালোবাজারে বাড়তি দামে বিক্রি করে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার টিকেট থাকলেও 'নেই' বলে সংকট তৈরি করার খবর সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত দেখা যেত। কোনও কোনও সময় একই সিটের টিকেট একাধিক মানুষকে বিক্রির অভিযোগও উঠেছে। এর থেকে সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তি হয় তো বটেই, সরকারও আয় থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক সময় এটাও দেখা যায়, বিনা টিকেটে যাত্রী ভ্রমণের প্রবণতা বাড়ছে। গত কয়েক বছরে, ই-টিকেটিং চালু হওয়ার ফলে এই পুরো ব্যবস্থাপনাটি ধীরে ধীরে গুছিয়ে উঠছে। আগে স্টেশনে বড় লাইনে দাঁড়ানো লাগত। এখন ঘরে বসেই অগ্রিম টিকেট কেনা যায়। আবার মোবাইলেই ভাড়া পরিশোধ করা যায়। জানা যায় ট্রেনের সময়সূচি এবং অবস্থান সম্পর্কেও।

সরকারি উদ্যোগে ২০১২ সালে রেলের ই-টিকেটিংয়ের ধারাবাহিকতা ধরেই বেসরকারি পরিবহন ব্যবস্থাতেও ই-টিকেটিং চালু হয় এবং ধাপে ধাপে তা বিকশিত হয়ে বর্তমানে চালু রয়েছে টিকেট কাটার অনেক ধরনের অনলাইন সেবা।

উদ্ভাবনের নিরন্তর প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ও জটিলতা কাটিয়ে দিনদিন তা সহজ করার প্রক্রিয়াও চলছে। আজকে যে নাগরিক জন্ম নিচ্ছেন তার জন্মনিবন্ধন থেকে শুরু করে জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, শিক্ষা, ভূমিসেবাসহ রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য প্রায় সকল তথ্য ও সেবাই রয়েছে অনলাইনে।

জিটুই মূলত সরকার ও তার কর্মচারীর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও কাজের প্রক্রিয়া সহজ করে। এর আওতায় রয়েছে নথি ব্যবস্থাপনা, কর্মচারী নিয়োগ, কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বেতন-ভাতা ব্যবস্থাপনা, ছুটির আবেদন এবং সরকারি সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা। অন্যদিকে জিটুজি বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বিভাগ এবং দপ্তরের মধ্যে বিরামহীন আন্তঃযোগাযোগ নিশ্চিত করে।

জিটুবি ই-গভর্নেন্সে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপন করে সময় এবং পরিচালন খরচ কমিয়ে দেয়। এই গভর্নেন্সের আওতায় রয়েছে লাইসেন্সিং, পারমিট, আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া এবং রাজস্ব সংগ্রহের মতো সেবাগুলো। ব্যবসা-সম্পর্কিত লেনদেন এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার অনুমোদন বা সম্মতিও সহজ হয়েছে। বাংলাদেশের মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এ ধরনের গভর্নেন্সের একটি উদাহরণ।

জিটুবি-এর আলাপে রাইড শেয়ারিং অ্যাপের উদাহরণও দেওয়া যায়। এই যে, মোবাইলেই বাইক বা গাড়ি কল করে যে সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া যায়, এর পেছনে একটি ইকোসিস্টেম কাজ করে। মোবাইল নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, চালকের সংযোগ ও তার অবস্থানের তথ্য, রাস্তার যান চলাচলের অবস্থা ও অবস্থান ইত্যাদি এই ইকোসিস্টেমের অংশ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্স প্রদান ও অবকাঠামো সুবিধা দেওয়ার মধ্য দিয়ে সরকার এই ইকোসিস্টেম কাজ করাতে ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে আন্তঃসংযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

যানবাহন ভাড়ার এই সহজ ব্যবস্থাপনাটি কিন্তু একদিনে আসেনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই ধাপে ধাপে আজকের দিনে এসেছে। এক্ষেত্রে এই বাইক ব্যবস্থাপনার অ্যাপটি একটি 'উদ্ভাবন'। আর যেহেতু উদ্ভাবন একটি চলমান প্রক্রিয়া, ফলে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিনই নাগরিক চাহিদা মেটাতে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন সেবা। যেমন- ফুড ডেলিভারি, পার্সেল, কাঁচাবাজার থেকে শুরু করে গৃহকর্মী পর্যন্ত পাওয়া যায় অনলাইনেই।

জিটুই মূলত সরকার ও তার কর্মচারীর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও কাজের প্রক্রিয়া সহজ করে। এর আওতায় রয়েছে নথি ব্যবস্থাপনা, কর্মচারী নিয়োগ, কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বেতন-ভাতা ব্যবস্থাপনা, ছুটির আবেদন এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা। অন্যদিকে জিটুজি বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বিভাগ এবং দপ্তরের মধ্যে বিরামহীন আন্তঃযোগাযোগ নিশ্চিত করে।

> ই-গভর্নেন্স মানে শুধু সরকারি সেবা অনলাইনে আনা নয়। বরং এটি সরকারের কাজের ধরন এবং নাগরিকদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার পদ্ধতিতেও রূপান্তর ঘটায়।

সূত্র

ছিকস, আর. (২০০৬)। *ইমপ্লিমেন্টিং অ্যান্ড ম্যানেজিং ই-গভর্নমেন্ট: এন ইন্টারন্যাশনাল টেক্সট।* লন্ডন: সেজ পাবলিকেশন্স।

সিটিজেন নেট: প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা

উদ্ভাবনের সংস্কৃতির একটি ‘কেইস স্টাডি’ বিভিন্ন সময়ে আলোচিত হয়। বলা হয়, সরকারি সেবায় ‘উদ্ভাবনের সংস্কৃতি’ যোগ হওয়ার পেছনে নেদারল্যান্ডস পুলিশের এক সদস্যের একটি উদ্ভাবন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আর-ওয়ান বা ‘রিসপন্ডেন্ট ওয়ান’ হিসেবেই তাকে ‘কেইস স্টাডি’তে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ১৯৯৩ সালে ‘সিটিজেন নেট’ ধারণা দেন। বিভিন্ন অপরাধের ঘটনা তদন্তের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারেন, খবর জানার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ দ্রুত পৌঁছানোর পরও অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য সহজে সংগ্রহ করা যায় না, অপরাধীও ধরা পড়ে না। কাজেই তিনি এমন একটি সিস্টেম তৈরির চিন্তা করলেন, যেখানে নাগরিকদের কাছ থেকেই সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সম্ভাব্য অপরাধের তথ্য টেলিফোনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। অর্থাৎ অপরাধ প্রতিরোধে নাগরিকেরা সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত হন। ইন্টারনেট তখনও ব্যাপকভাবে প্রচলন না হওয়ায়, স্থানীয় কমিউনিটি মিটিং, পোস্টার, লিফলেট এবং টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদান করা হতো।

সহকর্মীদের কাছে এই আইডিয়া নিয়ে গেলে তারা তেমন গুরুত্বের সাথে নেননি। তবে আর-ওয়ান নিজের ধারণাটিকে সময়ের সাথে সাথে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

অবশেষে ১৯৯৭ সালে আর-ওয়ান-এর উদ্ভাবনের স্বীকৃতি মেলে। ‘সিটিজেন নেট’ প্রকল্পের আইডিয়ার জন্য তিনি আঞ্চলিক পুলিশের দপ্তর থেকে পুরস্কৃত হন। ধীরে ধীরে পুরো নেদারল্যান্ডসেই এই সিস্টেমটি চালু হয় ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে।

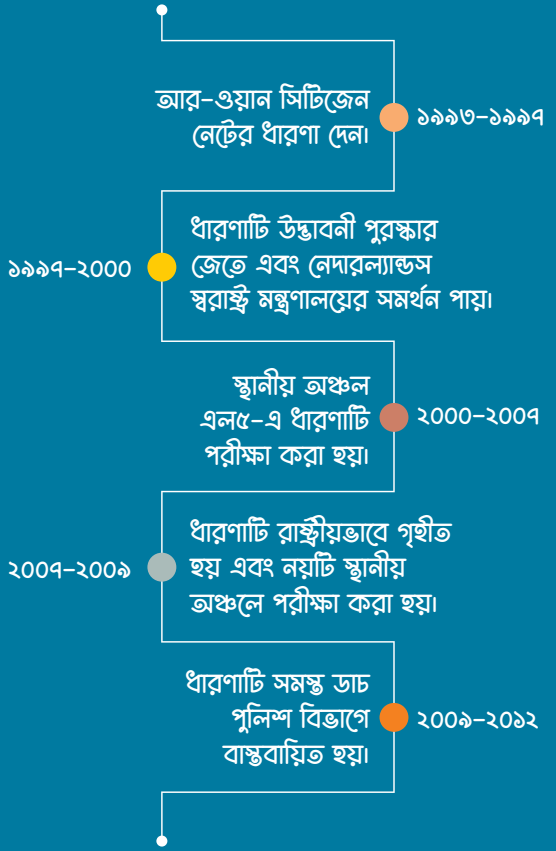

নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট এবং সৃজনশীল ধ্বংসযজ্ঞ তত্ত্ব

‘ই-গভর্নেন্স’ ধারণা পর্যন্ত আসার আগেও সরকারি সেবায় নানা ধাপে ‘উদ্ভাবনের সংস্কৃতি’ এসেছে।

সরকারি দপ্তরে এর প্রয়োগ শুরু ১৯৮০-এর দশকে ‘নিও লিবারেলিজম’ বা নয়া-উদারতাবাদ তত্ত্বের প্রভাবের সঙ্গে ‘উদ্ভাবনের সংস্কৃতি’র সংযোগ রয়েছে। বলা যায়, তখনই যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনের সংস্কৃতি বিকাশের ধারাটি শুরু হয়। ব্যয় ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ভর্তুকিও কমিয়ে এনে সরকারি দপ্তর ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ করতে মনোযোগী হয় নিও লিবারিস্ট সরকারগুলো। নাগরিককেন্দ্রিক সেবাব্যবস্থাও চালু করা হয়। এই পুরো ব্যবস্থাটিকে বলা হয় ‘নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট’ (এনপিএম)।

স্কটল্যান্ডে জন্ম নেওয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার হুডকে এনপিএম-এর তত্ত্বগত কাঠামোর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরা হলেও আরও অনেক চিন্তাবিদের অবদান রয়েছে। বিশেষ করে ডেভিড অসবর্ন এবং টেড গেবলার ১৯৯২ সালে তাদের প্রকাশিত গ্রন্থ ‘রিইনভেন্টিং গভর্নমেন্ট’-এ সরকারি খাতে বাজারভিত্তিক পদ্ধতি প্রচলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

চিত্র ১.২: জনসেবা খাতের রূপান্তর

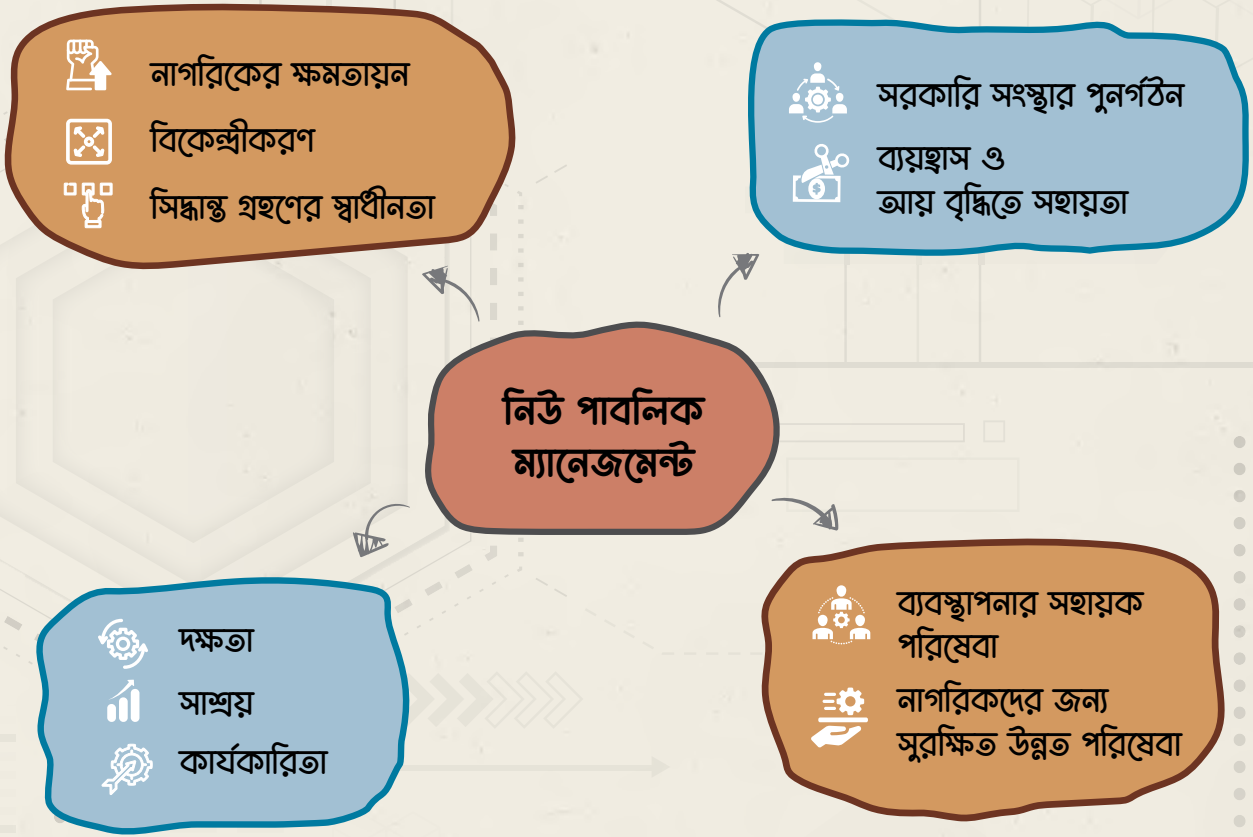

সূত্র: অসবর্ন, ডি. এবং গ্যাবলার, টি. (১৯৯২)। *রিইনভেন্টিং গভর্নমেন্ট: হাউ দ্য এন্টারপ্রেনিউরিয়াল স্পিরিট ইজ ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর*। রিডিং, ম্যাসাচুসেটস: অ্যাডিসন-ওয়েসলি পাবলিশিং কোম্পানি। (অনুপ্রাণিত)

নিও লিবারেলিজম, এনপিএম এবং উদ্ভাবনের সংস্কৃতির সঙ্গে 'ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশন' বা 'সৃজনশীল ধ্বংসযজ্ঞ'-এর ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১৯৪২ সালে প্রকাশিত 'ক্যাপিটালিজম, সোশালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' গ্রন্থে অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ জোসেফ শাম্পেটারের এই শব্দযুগল ব্যবহারের পর সেটি অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবদদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

শাম্পেটারের তত্ত্বটি এক সেট লেগোর উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। এক সেট লেগো ব্যবহার করে যেমন একটি রাজপ্রাসাদ তৈরি যায়, তেমনি একটি বহুতল ভবনও তৈরি করা যায়। তবে রাজপ্রাসাদ তৈরি করার পর, সেটিকে আবার বহুতল ভবনের রূপ দিতে হলে আগে রাজপ্রাসাদ ভেঙে লেগোর টুকরাগুলোকে আলাদা করতে হবে।

পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের সরকারও নাগরিক সেবা খাতে ভর্তুকি কমিয়ে আনতে এবং জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছাতে নিজেদের দপ্তরগুলোতে এনপিএম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। বর্তমানে এনপিএম বাস্তবায়নের মূল হাতিয়ারই ই-গভর্নেন্স।

কাঠামোতে রূপান্তর

ই-গভর্নমেন্ট এবং ই-গভর্নেন্স শব্দ দুটো প্রায়ই পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে, এই দুইটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ই-গভর্নমেন্ট হলো নাগরিকদের দ্রুত ও সহজে সরকারি সেবা প্রদানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। অন্যদিকে, ই-গভর্নেন্স একটি বৃহত্তর ধারণা, যা সুশাসন, নীতি প্রণয়ন এবং উন্নয়নে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সরকার, নাগরিক, উন্নয়ন সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে জনবান্ধব সরকারি সেবা কাঠামো নিশ্চিত করে। ই-গভর্নমেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করেই একটি বৃহত্তর কাঠামো তৈরি করে ই-গভর্নেন্স।

তবে দুই ক্ষেত্রেই 'উদ্ভাবন' বলতে কোনও প্রশাসনিক কাঠামোর বর্তমান ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করতে প্রযুক্তির প্রয়োগকে বোঝায়। আর এর পরিবর্তন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিবর্তনের ব্যাপ্তি অনুসারে সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন তিনভাবে হয়– ইনক্রিমেন্টাল বা ক্রমবর্ধমান, ডিজরাপটিভ বা বর্তমান ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করা এবং র‍্যাডিক্যাল বা যুগান্তকারী।

ই-গভর্নেন্স একটি বৃহত্তর ধারণা, যা সুশাসন, নীতি প্রণয়ন এবং উন্নয়নে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সরকার, নাগরিক, উন্নয়ন সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে জনবান্ধব সরকারি সেবাকাঠামো নিশ্চিত করে।

উদ্ভাবনের ধরন	সংজ্ঞা	উদাহরণ
ইনক্রিমেন্টাল	একটি চলমান সিস্টেমের ক্রমাগত উন্নতি	ই-ফাইল ম্যানেজমেন্ট থেকে ই-নথি এবং ডি-নথিতে রূপান্তর
ডিজরাপটিভ	বিদ্যমান ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তি বা ব্যবসায়িক মডেলের সংযোজন	বাংলাদেশে মোবাইল আর্থিক পরিষেবা ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা
র‍্যাডিক্যাল	উদ্ভাবনী প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা তৈরি	স্মার্টফোনের প্রচলন এবং বাংলাদেশে ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনে ডিজিটাল সেন্টার চালু

সূত্র: ক্রিস্টেনসেন, সি.এম. (১৯৯৭)। *দ্য ইনোভেটরস ডিলেমা: হোয়েন নিউ টেকনোলজিস কজ গ্রেট ফার্মস টু ফেইল*। বোস্টন, এমএ: হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ প্রেস। (অনুপ্রাণিত)

চিত্র ১.৩: ই-গভর্নেন্স ২.০ মডেলের বিবর্তন

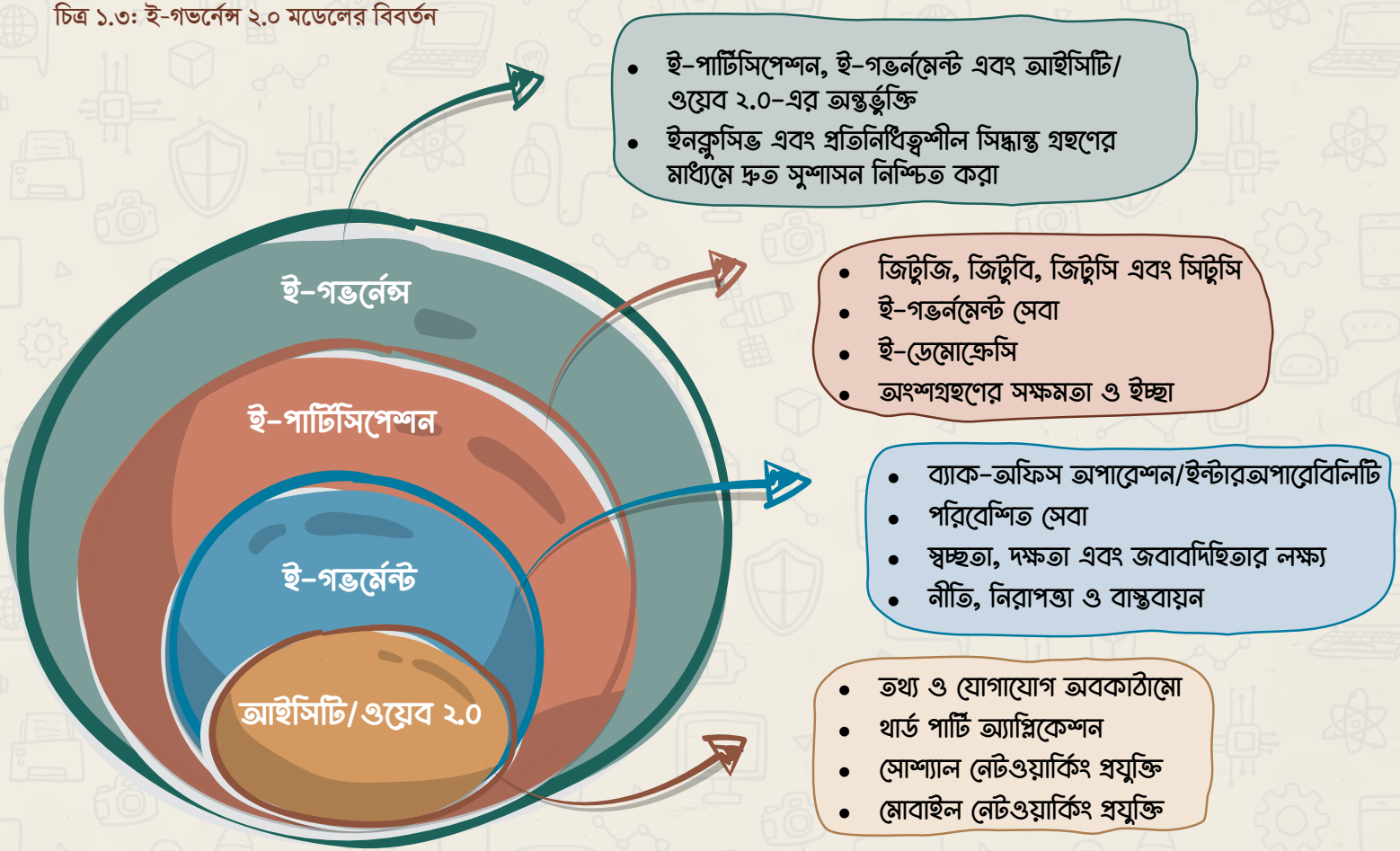

সূত্র: হফম্যান, বি (২০১৭) *ইভোল্যুশনারি ই-গভর্নেন্স ২.০ মডেল*, রিসার্চগেট।

সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনের সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছিল। আজকে আমরা যে ইন্টারনেট ব্যবহার করছি তা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক দপ্তরের উদ্যোগে ১৯৬০ সালে উদ্ভাবন হয়েছিল।

> বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রায় দুই দশকের পথ চলায় ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের অনেক কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তবে প্রযুক্তিবান্ধব সেবার সঙ্গে নাগরিকদের যুক্ত করার ব্যর্থতা যেমন রয়েছে তেমনি যুগোপযোগী প্রযুক্তিকে সেবাদানের কাজে না লাগানোর ব্যর্থতাও রয়েছে।

আশার দিক হচ্ছে, শত বছরের পুরনো সেবাকাঠামোকে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি-নির্ভর কাঠামো তৈরির মধ্য দিয়ে সেবা দেওয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ডিজিটাল সেন্টার, ই-নথি/ডি-নথি, মাইগভ, ই-কোর্ট আইবাস, কোভিড ভ্যাক্সিন ব্যবস্থাপনার জন্য সুরক্ষা অ্যাপ এবং বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা কিংবা সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ– সবকিছুই সেবাকাঠামোর উদ্ভাবন। এসব উদ্ভাবনের ফলে সরকারি সেবা বৈষম্যহীনভাবে নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে।

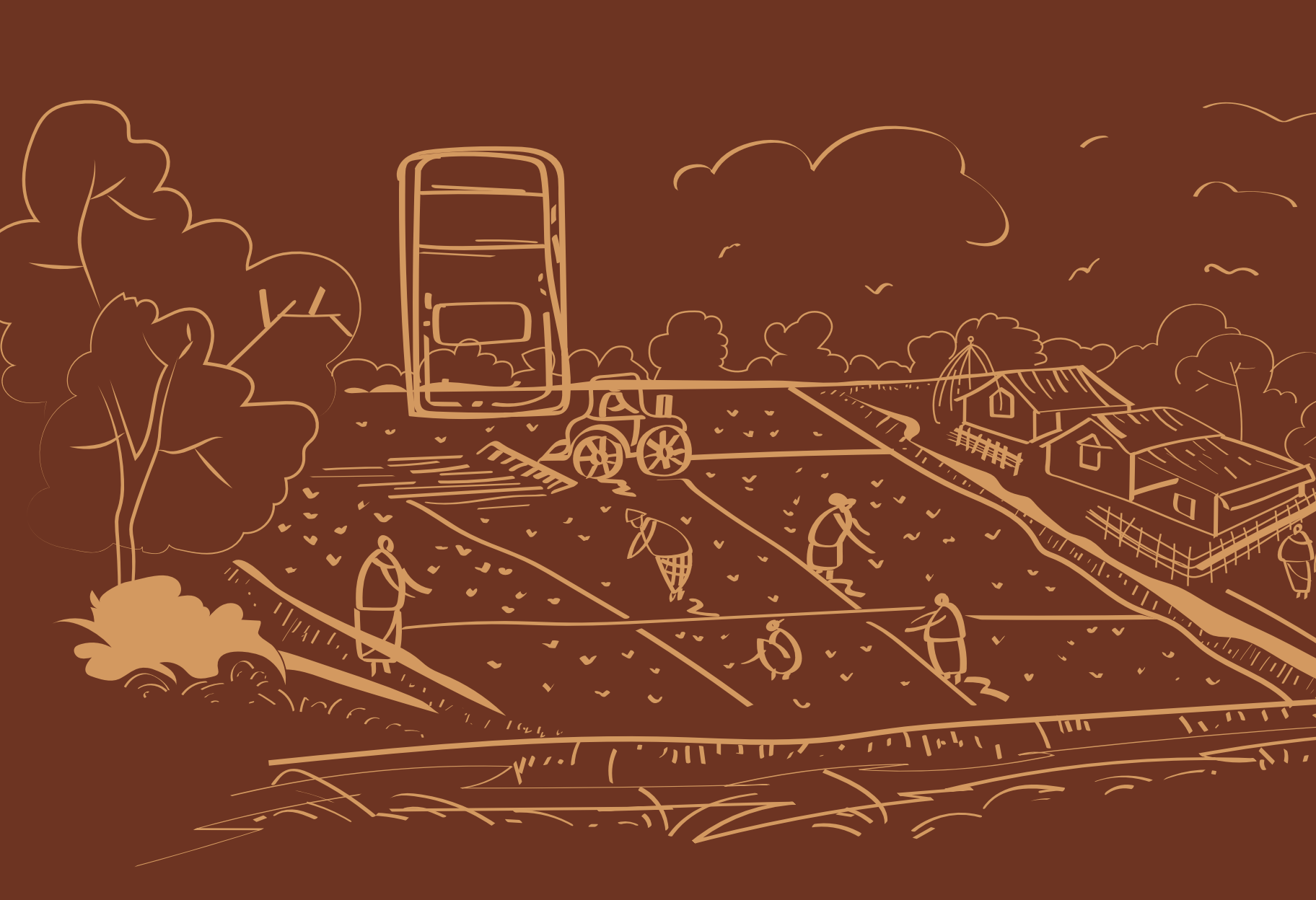

রূপান্তরের অনুঘটক

২০০১ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে ডব্লিউএসআইএস গঠনের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাজ নির্মাণের যাত্রায় যোগ দিতে দেরি করেনি বাংলাদেশ। পরের বছরই অর্থাৎ ২০০২ সালে ই-গভর্নমেন্ট নীতিমালা তৈরি করে। ২০০৩-২০০৬ সালের মধ্যে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে আইসিটি টাস্কফোর্স ও এসআইসিটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। তবে ২০০৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম চালুর মধ্যে দিয়ে সেই যাত্রার গতি অনেকগুণ বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের পথপরিক্রমায় কুইক উইন প্রকল্প, ডিজিটাল সেন্টার, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ৩৩৩ হেল্পলাইন, মাইগভ প্ল্যাটফর্ম এবং এমপ্যাথি ট্রেনিং প্রোগ্রামের মতো অসংখ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজ, দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকারি সেবার ডিজিটাল রূপান্তর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রশাসনিক দক্ষতা ও দুর্নীতি হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে।

সকল দেশের জন্য তথ্য, জ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। এর পূর্ণ সুবিধা পেতে বৈশ্বিক ঐক্য ও প্রতিশ্রুতি দরকার। তথ্য সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও নাগরিক সমাজকে মিলিতভাবে একটি ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

ডব্লিউএসআইএস গঠন প্রসঙ্গে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের রেজুলেশন।

নিউইয়র্ক, ২১ ডিসেম্বর, ২০০১

আমরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের সকল মানুষের উপকার নিশ্চিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা অংশীজনেরা এক সাথে কাজ করে তথ্য-যোগাযোগ অবকাঠামো ও প্রায়োগিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাবো।

পারস্পরিক সহযোগিতায় তথ্য-জ্ঞানের উন্নয়ন ও সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সবার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য করবো। অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটাবো। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সম্মান জানিয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা উৎসাহিত করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্য-সমাজের নৈতিক মান নির্ধারণ করবো।

সম্মিলিতভাবে মূলনীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য-সমাজ গড়ে তুলবো।

ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি,
ডকুমেন্ট ডব্লিউএসআইএস-০৩/জেনেভা/ডক/৪-ই

ডিক্লারেশন অব প্রিন্সিপালস, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৩

জেনেভায় এই শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে তথ্যসমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচিত হলো। বাংলাদেশের সর্বত্র আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তুলে প্রতিটি নাগরিককে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া হবে। পাশাপাশি আইসিটি সুবিধা ব্যবহার করে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ব্যাংকিং, নাগরিক সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রকে উন্নত করা হবে। দরিদ্র দেশগুলোর প্রধান সমস্যা হলো সম্পদ ও আইসিটি অবকাঠামোর অভাব। পাশাপাশি আছে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য। সম্মেলনের প্রস্তুতি সভাগুলোতে গ্রহণ করা নীতি ও কর্মপরিকল্পনা দিয়ে এসব সমস্যা দূর হবে।

ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি-এর প্রথম পর্বে
বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

জেনেভা, ২০০৩

ই-গভর্নেন্সের গোড়াপত্তন

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৫৬তম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে রেজ্যুলুশন ৫৬/১৮৩-এর আলোকে সবার জন্য জনবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উন্নয়নমুখী একটি তথ্য-সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস)। এই শীর্ষ সম্মেলন দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ২০০৩ সালের ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এবং দ্বিতীয়টি ২০০৫ সালের ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর তিউনিসিয়ায়।

ডব্লিউএসআইএস-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, যিনি ১১-দফা এজেন্ডা অনুমোদন করেন এবং ২০০৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি তথ্যসমৃদ্ধ সমাজে পরিণত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় আইসিটি নীতিতে ই-গভর্নমেন্ট চালুর বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ঘোষণা করা হয়, "সরকার প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি, সম্পদের অপচয় হ্রাস, পরিকল্পনা উন্নতকরণ এবং সেবার মান বৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করবে।" তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) নীতির নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপারসন এবং সদস্য-সচিব হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে নিয়ে আইসিটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। ২০০২ সালে গঠন হওয়া 'সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্ক ফোর্স' (এসআইসিটি) প্রকল্পটি ছিল তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নয়নের প্রথম কোনও সরকারি উদ্যোগ।

২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় আইসিটি নীতিতে ই-গভর্নমেন্ট চালুর বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ঘোষণা করা হয়, "সরকার প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি, সম্পদের অপচয় হ্রাস, পরিকল্পনা উন্নতকরণ এবং সেবার মান বৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করবে।"

প্রকল্পটি ২০০৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এসআইসিটি-এর আওতায় উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হলো: শিক্ষাবোর্ডের অনলাইন রেজাল্ট, মানিকগঞ্জ ভূমি রেকর্ড আর্কাইভ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনলাইন বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা, ডিসি অফিস ও ক্যাবিনেট ডিভিশনের অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম,

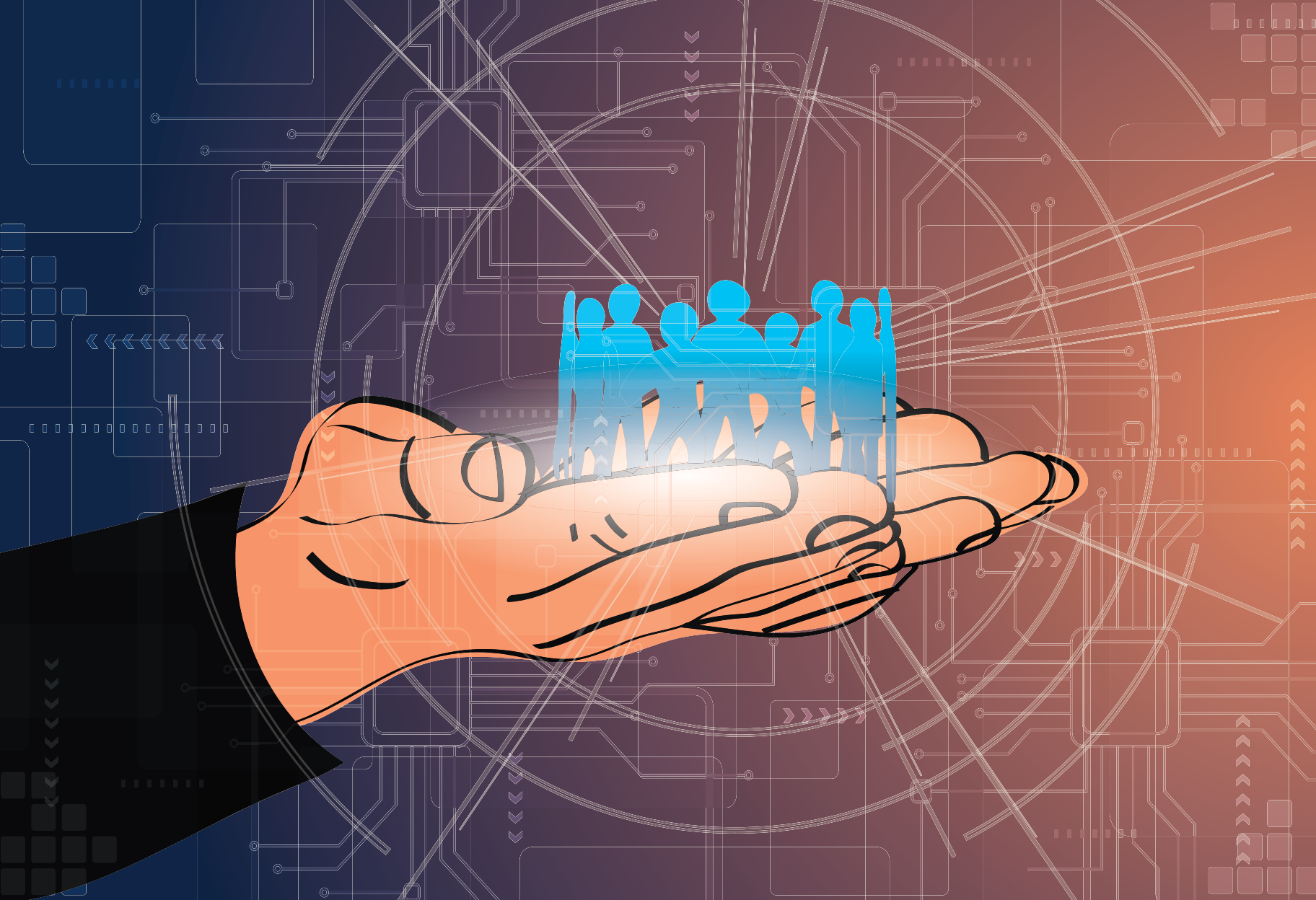

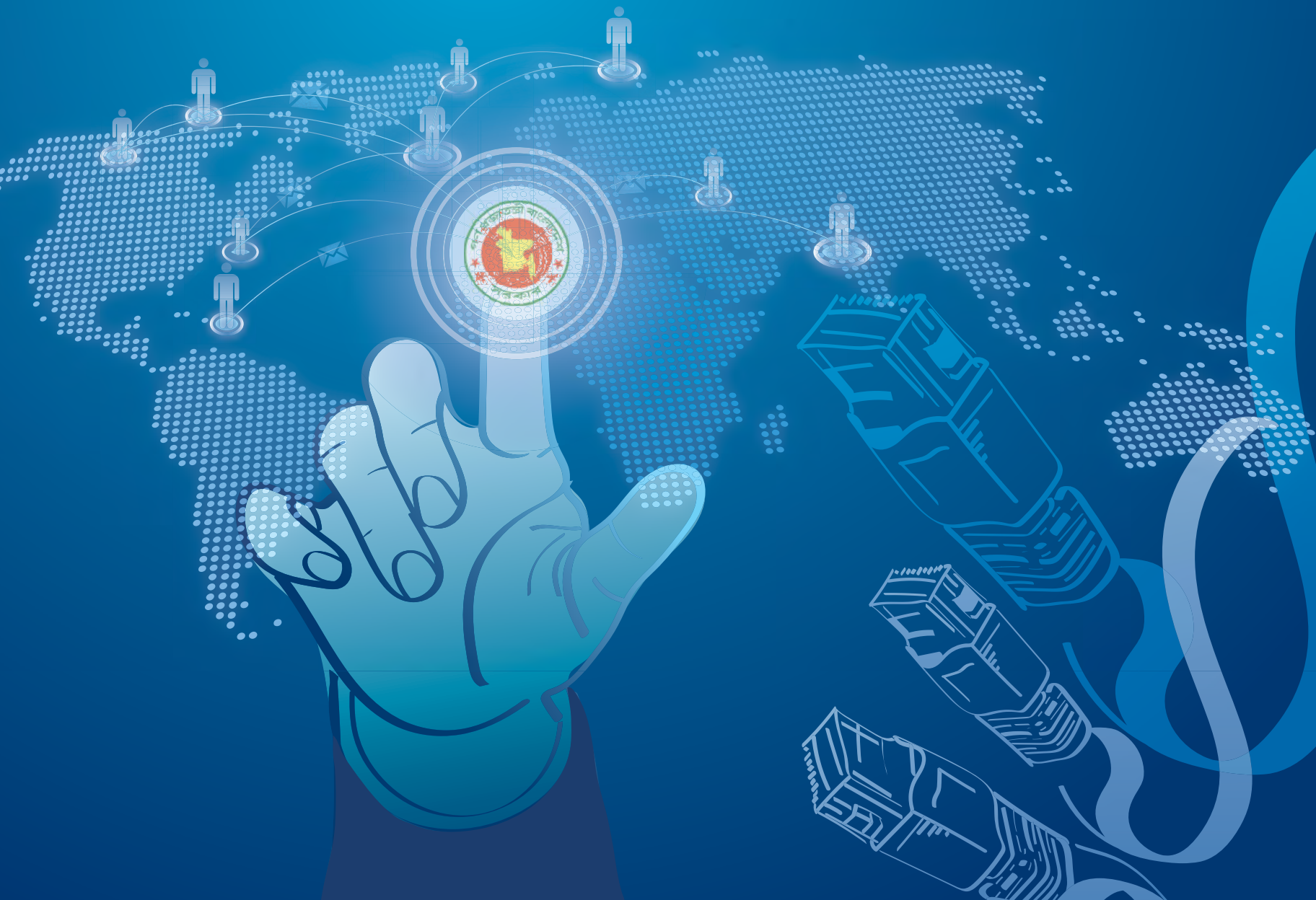

মৎস্য, পশু সম্পদ ও নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিমুলেশন সিস্টেম, সচিবালয়ে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, কারাগার ও ডিসি অফিস অটোমেশন, পিএসসি পরীক্ষা অটোমেশন, বঙ্গভবন প্রক্রিয়া অটোমেশন, সরকারি অফিসগুলোতে ভিডিও কনফারেন্সিং, ডিজিটাল টাউন, ই-পুলিশ এবং ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার স্থাপন।

অন্যদিকে বৈশ্বিক পরিসরে ডব্লিউএসআইএস-এর প্রথম পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। এ সম্মেলনে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়, যেখানে বাংলাদেশ এই উদ্যোগকে সমর্থন করে। তৎকালীন সরকার প্রধান সম্মেলনে আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারের নেওয়া এসআইসিটি প্রকল্পের কথা তুলে ধরে প্রতিটি নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অঙ্গীকার তুলে ধরেন। পাশাপাশি আইসিটি সুবিধা ব্যবহার করে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ব্যাংকিং, নাগরিক সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রকে উন্নত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দ্রুত তথ্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতি দেন।

২০০৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি)-এর কারিগরি সহায়তায় আরেকটি প্রকল্প শুরু হয়, যা ই-গভর্নেন্সের জন্য একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি প্রক্রিয়া পুনর্গঠন এবং প্রশাসনে প্রযুক্তিনির্ভর সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ বছরই নাগরিকদের সুবিধার জন্য ৫০টি বহুল ব্যবহৃত সরকারি ফর্ম অনলাইনে প্রকাশ করা হয়, যা দেশের প্রথম ই-গভর্নেন্স উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম।

২০০৫ সালে তিউনিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্বের সম্মেলনে ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তি স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন ‘স্ট্রেনদেনিং দ্য আইসিটি ক্যাপাসিটি অব প্রাইম মিনিস্টার’স অফিস’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বৈশ্বিক ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম সরেজমিনে দেখে আসার জন্য একটি প্রতিনিধি দল মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর করে ২০০৬ সালে।

তৎকালীন সরকার প্রধান সম্মেলনে আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারের নেওয়া এসআইসিটি প্রকল্পের কথা তুলে ধরে প্রতিটি নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অঙ্গীকার তুলে ধরেন।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ওই তিনটি দেশের ই-গভর্নমেন্ট ও ই-সিটিজেন কার্যক্রম সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রতিনিধি দলের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। সুপারিশের আলোকে গঠিত সাব-কমিটি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আইসিটি ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ সভায় ই-গভর্নমেন্ট 'প্ল্যান অব অ্যাকশন' তৈরি করে, যাতে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়:

ই-গভর্নমেন্ট 'প্ল্যান অব অ্যাকশন' বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি ই-গভর্নেন্স সেল স্থাপন এবং এই সেলকে সহায়তার জন্য এটুআই (একসেস টু ইনফরমেশন) প্রোগ্রাম চালু করার প্রস্তাব ২০০৬ সালের ৬ জুলাই অনুমোদন দেওয়া হয়।

ক. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বর্তমান কাঠামোর মধ্যে ই-গভর্নমেন্ট সেল স্থাপন

খ. সরকারের ই-গভর্নমেন্ট কার্যক্রমকে জোরদার করতে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

গ. ই-গভর্নমেন্ট সেলকে সহায়তা দিতে একটি কারিগরি সহায়তা প্রোগ্রাম চালু করা

ই-গভর্নমেন্ট 'প্ল্যান অব অ্যাকশন' বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি ই-গভর্নেন্স সেল স্থাপন এবং এই সেলকে সহায়তার জন্য এটুআই (একসেস টু ইনফরমেশন) প্রোগ্রাম চালু করার প্রস্তাব ২০০৬ সালের ৬ জুলাই অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রোগ্রাম চালুর জন্য ইউএনডিপি একটি প্রোগ্রাম ইনিশিয়েশন ডকুমেন্ট (পিআইডি) প্রণয়ন করে, যা আগস্টে চূড়ান্ত করা হয়।

একই সময়, বিশ্বব্যাংক-সমর্থিত 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (ইএমটিএপি)-এর আওতায় আইসিটি ব্যবহারের জন্য কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। তবে, দেশের সবচেয়ে বড় আইসিটি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয় ২০০৭-২০০৮ সালে, 'ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা' তৈরির মাধ্যমে।

> সরকারি কার্যক্রমকে তথ্যপ্রযুক্তিতে রূপান্তর, সেবা প্রদান উন্নত এবং নাগরিক অংশগ্রহণ বিস্তৃত করার জন্য আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) এর ব্যবহার হিসেবে ই-গভর্নেন্সকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

সূত্র

এনডু, ভি. (২০০৪)। ই-গভর্নেন্স ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিস: অপরচুনিটিজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস। *ইলেকট্রনিক জার্নাল অফ ইনফরমেশন সিস্টেমস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিস*, ১৮(১), ১১-২৪।

নিরীক্ষা পর্যায়

বাংলাদেশের 'ই-গভর্নেন্স সেল' যাত্রা শুরুর পর ২০০৭-২০০৮ সালে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে বৈঠক করে এর পরিসর আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। উদ্যোগ নেওয়া হয় একটি ই-গভর্নেন্স হরাইজন স্ক্যান রিপোর্ট তৈরির।

> হরাইজন স্ক্যান রিপোর্ট হলো, ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ এবং উদ্ভাবনী সমাধানের একটি গবেষণা-ভিত্তিক প্রতিবেদন। এতে দেশের ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমের একটি দালিলিক চিত্র প্রণয়ন করা হয়।

এই লক্ষ্যে দেশের মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন গবেষণাপত্র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত আইসিটি কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক পরামর্শ সভা ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে কর্মশালা ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়। হরাইজন স্ক্যান রিপোর্টের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে নাগরিকদের মধ্যে মোট ১১টি জেলার ২২টি উপজেলায় জরিপ চালানো হয়। ২০০৭ সালে যা প্রকাশ করা হয়।

ই-গভর্নেন্স হরাইজন স্ক্যানিং রিপোর্ট ২০০৭ পড়তে স্ক্যান করুন

চিত্র ২.১: বুদ্ধিদীপ্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় হরাইজন স্ক্যানিং

সূত্র: ইনস্টিটিউট অফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (আইআরএম)। (২০১৮)। *হরাইজন স্ক্যানিং: এ প্র্যাকটিশনার্স গাইড*। ইনোভেশন স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত। লন্ডন: ইনস্টিটিউট অফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, পৃ. ৯। (অনুপ্রাণিত)

কুইক উইন হলো এমন উদ্যোগ যা স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং সহজে বাস্তবায়নযোগ্য, এবং যার মাধ্যমে দৃশ্যমান ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করা যায়। সাধারণত এটি এমন সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধানে ব্যবহার করা হয়, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এর পরে জাতীয় ই-গভর্নেন্স ভিশন সেটিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি ভিশন দলিল প্রস্তুত করা হয়। আর তারপরে আসে কুইক উইন প্রজেক্টের পালা। সহজ কথায় কুইক উইন হলো এমন উদ্যোগ যা স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং সহজে বাস্তবায়নযোগ্য, এবং যার মাধ্যমে দৃশ্যমান ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করা যায়। সাধারণত এটি এমন সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধানে ব্যবহার করা হয়, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রথমেই সব মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত সেরা জনবান্ধব সেবাগুলোকে বাছাই করে প্রায় ৭০০ কুইক উইন প্রজেক্ট তৈরি হয়। এর কিছু প্রজেক্ট বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এটুআই যৌথভাবে পাইলটিং শুরু করে। তখন আসলে কেবল যাত্রা শুরু বিধায় কোনো 'ইকোসিস্টেম' তৈরি হয়নি। এর মধ্যে প্রান্তিক জনগণকে সেবা দেওয়ার জন্য কী করা যায় সেটি নিয়ে ভাবনা চলছিল। সেই জায়গা থেকেই ২০০৭ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার মাধাইনগর ইউনিয়ন পরিষদে এবং দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ উপজেলার মুশিদহাট ইউনিয়ন পরিষদে কমিউনিটি ই-সেন্টার পাইলটিং করা হলো। দেখা গেল, কমিউনিটির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। আর তাই ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক একটি সেবাকাঠামো তৈরি করে নাম দেয়া হলো ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র। ২০১০ সালে সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়নে এর যাত্রা শুরু হলো। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা মডেলও তৈরি করা হল।

চিত্র ২.২: নাগরিক সেবার উন্নতির জন্য কুইক উইন প্রকল্পের একটি ইলাস্ট্রেশন

ডিজিটাল সেন্টার

ইউনিয়ন থেকে একই মডেল পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে যুক্ত হওয়ার পর এর নামকরণ করা হয় ডিজিটাল সেন্টার। প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবা প্রদানে এই আইডিয়া দেশের বাইরে, যেমন, সৌদি আরবেও বাস্তবায়ন করা হলো। এরপর গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য গাজীপুর এবং খুলনায় মৎস্যজীবীদের জন্য ডিজিটাল সেন্টার চালু হয়। যশোর জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে ২০১১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে একটি ই-সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হলো। যেসব নাগরিক জেলা প্রশাসকের অফিসে দূর-দূরান্ত থেকে আসেন, তারা যেন প্রযুক্তিভিত্তিক সেবাগুলো এখান থেকেই পান সেই লক্ষ্যেই এটি চালু হয়েছিল। এই কার্যক্রম সফল হওয়ায় প্রতিটি জেলা প্রশাসকের অফিসেই চালু করা হয় জেলা ই-সেবা কেন্দ্র।

সশরীরে তথ্যসেবা গ্রহণ সহজ করার পাশাপাশি অনলাইনে সেবা কার্যক্রম সহজ করতে ওয়েবসাইট ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে এই সেবাগুলোকে নিয়ে আসা হয়। তখন ৬৪টি জেলা বাতায়ন তৈরি হলো। এরপরই আইডিয়াটি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর বা বিভাগগুলোর জন্যও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলো। ধাপে ধাপে সরকারের সকল দপ্তরকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে ২০১৪ সালে জাতীয় তথ্য বাতায়ন তৈরি হয়। এটি এমন একটি ইকোসিস্টেম, যা নির্মিত হওয়ায় স্ব স্ব দপ্তর সরকারি তথ্যসেবা নাগরিকের কাছে তুলে ধরতে পারছে।

ইউনিয়ন থেকে একই মডেল পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে যুক্ত হওয়ার পর এর নামকরণ করা হয় ডিজিটাল সেন্টার।

বৈষম্য দূর করতে হলে, যাদের সেবা কেন্দ্রে যাওয়ার কিংবা ওয়েবসাইট ব্যবহারের সক্ষমতা নেই তাদেরকেও এই ইকোসিস্টেমে আনতে হবে। ২০১০ সালে সকল ফোনে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধির কাজ শুরু হয়। এর ফলে প্রান্তিক মানুষকে ধীরে ধীরে প্রযুক্তির আওতায় আনা সহজ হয়েছে। এদেশে 'বাটন' ফোন ব্যবহারকারী এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষম নন এমন ব্যক্তিদের তখন এর আওতায় নিয়ে আসার ভাবনা থেকেই সরকারি তথ্য ও সেবাদানে ২০১৮ সালে চালু হলো জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩, যেখান থেকে নাগরিকরা নন-ইমার্জেন্সি সার্ভিস পেয়ে আসছেন। অর্থাৎ জাতীয় তথ্য বাতায়নের তথ্যগুলোই এখানে কল করে তারা পাবেন। জাতীয় হেল্পলাইনে প্রাথমিকভাবে জাতীয় তথ্য বাতায়নের তথ্যগুলো দিয়ে সেবা প্রদান শুরু হলেও পরে কোভিড অতিমারিতে এর সঙ্গে আরও অনেক সেবা যোগ হয়। অন্যদিকে জরুরি সেবার (পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং অ্যাম্বুলেন্স) জন্য ২০১৭ সালে চালু হয় ৯৯৯।

'ফিচার' ফোন ব্যবহারকারী এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষম নন এমন ব্যক্তিদের তখন ইকোসিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসার ভাবনা থেকেই সরকারি তথ্য ও সেবাদানে ২০১৮ সালে চালু হলো জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩।

'কুইক উইন' থেকে সেবাগুলোর ডিজিটাল রোডম্যাপ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরও অনলাইনে সেই সেবাগুলো দেওয়া শুরু করল। কিন্তু দেখা গেল যে, ইতোমধ্যেই এই সেবাগুলোর অসংখ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। তখন নাগরিকদের সুবিধার্থে সেবাগুলোকে একক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হলো। নাগরিকেরাও তখন তাদের প্রয়োজনীয় সেবা খুব সহজেই নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গা থেকে পেতে শুরু করলেন। এর মধ্যে ২০২০ সালে চালু হওয়া মাইগভ প্ল্যাটফর্মটি সকল সরকারি সেবাকে একক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার উদ্যোগ।

চিত্র ২.৩: বাংলাদেশের নাগরিক সেবা: ৩৩৩

সূত্র: এটুআই-এর পাঠ্য অবলম্বনে।

‘কুইক উইন’-এর পরে সরকারি কর্মকর্তাদের অনলাইন সেবা এবং উদ্ভাবনী সংস্কৃতিতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে ২০১৪ সালে এমপ্যাথি ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নাগরিকদের প্রয়োজন বুঝে এবং তাদের সুবিধা অনুযায়ী পরিকল্পিত সেবা সহজীকরণের একটি ধাপ হচ্ছে এমপ্যাথি ট্রেনিং।

> সাধারণ নাগরিকরা সরকারি সেবা গ্রহণে যেসব বাধা ও সংকটের মুখে পড়েন, সেসব সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের সেবা প্রদানে দক্ষতা বাড়ানো এবং উদ্ভাবনী সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে এমপ্যাথি ট্রেনিং আয়োজন করা হয়।

এতে সেবাদানকারী সরকারি কর্মচারীদের ‘নাগরিকের অবস্থান থেকে’ সরকারি সেবা নেওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ট্রেনিংয়ে তারা তাদের নিজ নিজ দপ্তরের সেবা ব্যবস্থার ত্রুটি শনাক্ত করতে এবং সেই ব্যবস্থা উন্নত করতে করণীয় সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে পারেন।

এমপ্যাথি ট্রেনিং শুধু একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নয়, উদ্ভাবনী সংস্কৃতি তৈরির প্রথম ধাপও। প্রশিক্ষণ শেষে, যারা সম্ভাব্য উদ্যোগের ধারণা নিয়ে আসেন, তাদের পাঁচ দিনের প্রকল্প নকশা ও ডকুমেন্টেশন কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হত । উদ্ভাবকদের জন্য পরামর্শকও নিয়োগ দেওয়া হয়, যিনি তাদের ধারণাকে আরও শাণিত করতে সহায়তা করেন। এছাড়া, দেশের সব সরকারি দপ্তরের ইনোভেশন টিম এই উদ্ভাবনগুলো বাস্তবায়নে সহায়তা করে। পাইলট প্রকল্প শেষে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে উদ্ভাবন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যাতে সফল উদ্ভাবনগুলো বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়ন করা যায়।

উদ্ভাবনী সংস্কৃতির এই যাত্রায় এটুআই অনুঘটক হিসেবে এবং কারিগরি সহায়তায় কাজ করছে।

ময়মনসিংহের একজন কৃষি কর্মকর্তার উদ্ভাবন হলো ‘কৃষকের জানালা’ মোবাইল অ্যাপ, যা মোবাইল স্ক্রিনে কৃষকদের শস্যের ছবি দেখে রোগবালাই শনাক্ত করা থেকে শুরু করে নানা কৃষি সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। ২০১৪ সালে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডিজিটাল দক্ষতা বাড়াতে আয়োজিত এমপ্যাথি ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার পর ওই কৃষি কর্মকর্তা কৃষকের সমস্যা সহজে সমাধানে এই অ্যাপটি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। ২০১৮ সালে অ্যাপটি উদ্ভাবনের পর সরকার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সেটি সারা দেশের কৃষকদের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বর্তমানে লক্ষাধিক কৃষক এই অ্যাপের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সেবা পাচ্ছেন।

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় মৎস্য অফিসার হিসেবে কর্মরত আরও দুইজন সরকারি কর্মকর্তা ঠিক একই রকম ‘Dr. Fish (মাছের ডাক্তার)’ অ্যাপটি উদ্ভাবন করেন ২০১৮ সালে। এটি দিয়ে মাছের রোগ নির্ণয় এবং পুকুর ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব। এটির জনপ্রিয়তা এখন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে। এই দুইজনও ২০১৪ সালের এমপ্যাথি ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

স্বাস্থ্যসেবায় তথ্যপ্রযুক্তির সংযোগ এবং সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আরেকটি বড় উদাহরণ বরিশালের উজিরপুরের থানা স্বাস্থ্য অফিসার তৈরি করেন। উপজেলার হতদরিদ্র মানুষ যেন সরকারি হাসপাতালের সেবা সহজে, কম সময়ে এবং বিড়ম্বনাহীনভাবে পান, সেইজন্য তিনি ২০১৮ সালে ‘হেলথ কার্ড’ চালুর উদ্যোগ নেন। প্রথমে স্বাস্থ্যকর্মীরা দরিদ্র মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীদের তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে ভিজিএফ কার্ড ও সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় থাকা সরকারি তালিকা মিলিয়ে নেন। পরের ধাপে হতদরিদ্র মানুষের ডাটা এন্ট্রি করা হয় এবং হেলথ কার্ড সরবরাহ করা হয়। এর ফলে সরকারি হাসপাতালে তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা পাওয়া শুরু করে। এতে সময় ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ সাশ্রয় হয়। পাশাপাশি রোগীর রোগের ইতিহাস এবং সেবা ব্যবস্থাপনাও চিকিৎসকদের জন্য সরল হয়ে যায়।

পথপরিক্রমা: বাংলাদেশের ই-গভর্নেন্স

দুই দশকে ই-গভর্নেন্সের এই অভিযাত্রায় সরকারি সেবা ও পরিষেবা প্রদানের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আখ চাষিদের নিয়ে শুরুর দিকের একটি উদ্যোগের উদাহরণ টানা যায়। চাষিদের হয়রানি কমাতে এবং আখের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে চালু করা হয় ই-পুর্জি। চাষিরা পূর্বে কাগজের পুর্জির (আখ সরবরাহের অনুমতিপত্র) মাধ্যমে আখের মূল্য পেতে গিয়ে নানা জটিলতার সম্মুখীন হতেন। আখ এমন একটি ফসল যা সতেজ অবস্থায় কারখানায় মাড়াইয়ের জন্য নিতে হয়। নইলে চিনি ভালো হয় না।

ই-পুর্জিতে দেশের প্রতিটি চিনিকলে সব আখচাষির তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়। সেখানে চাষির নাম-ঠিকানার পাশাপাশি তার বা তার নিজস্ব অথবা বিশ্বস্ত কারও মুঠোফোন নম্বর সংরক্ষণ করা হয়। সেই তথ্যভাণ্ডার থেকে চাষিদের কাছে আখ সরবরাহের জন্য বার্তা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ হলো ভূমি সেবার ক্ষেত্রে ডিজিটাল রেকর্ড রুম, ই-নামজারি, ই-পর্চা চালু করা হয় ২০১১ সালে। সরকার ভূমি উন্নয়ন কর (খাজনা) অনলাইনে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই সেবার মাধ্যমে নাগরিকরা এখন সহজেই ভূমি কর জমা দিতে পারেন। এ পদ্ধতিতে ভোগান্তি কমে গেছে এবং দুর্নীতির সুযোগও হ্রাস পেয়েছে। ধাপে ধাপে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অনলাইনেই সকল ভূমি সেবা দান কার্যক্রমের প্রক্রিয়া এগোচ্ছে।

এই ধারাবাহিক উদ্যোগগুলো জনগণের সময়, অর্থ ও পরিশ্রম সাশ্রয়ে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। ডিজিটাল সেবাগুলোর এ সাফল্যই প্রমাণ করে যে 'উদ্ভাবন' কেবল ধারণাগত বিষয় নয়, বরং এটি নাগরিক জীবনের উন্নয়নের মূলমন্ত্র।

২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়, ব্যয়, যাতায়াত (টিসিভি) সাশ্রয়

সময় ৮২%

ব্যয় ৭৮%

যাতায়াত ৮৫%

১৯.১ বিলিয়ন দিন সাশ্রয়

২১.৮ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয়

১২.৯ বিলিয়ন যাতায়াত সাশ্রয়

৫.৯ বিলিয়ন সেবা বিতরণ

রূপান্তরের দৃশ্যকল্প

বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ফলে নাগরিকরা সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সময়, খরচ ও যাতায়াতের ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ই-পাসপোর্ট, ই-মিউটেশন, ই-ট্যাক্স রিটার্ন এবং শিক্ষা সনদ যাচাইয়ের মতো সেবাগুলো এখন অনলাইনে খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সেবা এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে, যা নাগরিকদের জন্য খুবই সুবিধাজনক। ডি-নথি সরকারি দফতরগুলোতে কাগজবিহীন কার্যক্রম চালু করেছে, ফলে কাজের গতি বেড়েছে এবং স্বচ্ছতা এসেছে। জাতীয় তথ্য বাতায়ন সরকারি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি সহজ করেছে।

জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩-এর মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। ডিজিটাল সেন্টারগুলো জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিচ্ছে এবং স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি করছে। ভূমি সেবায় ই-পর্চা ও ই-নামজারির মাধ্যমে হয়রানি কমেছে এবং স্বচ্ছতা বেড়েছে। সরকারি সেবার (বিভিন্ন বিল ও পরিষেবা ফি) ডিজিটাল পেমেন্ট সহজ ও নিরাপদ করতে পেমেন্ট এগ্রিগেটর একপে তৈরি করা হয়েছে। বিচার বিভাগীয় বাতায়ন-এর মাধ্যমে বিচারিক সেবাগুলো নাগরিকদের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, ডিজিটাল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

আগে ভূমি নামজারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কমপক্ষে কয়েক মাস সময় লাগত। এখন এটি অনলাইনের মাধ্যমে মাত্র এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করা সম্ভব হচ্ছে। এই ডিজিটাল ব্যবস্থার ফলে দপ্তরে বারবার যাওয়ার ঝামেলা কমে এসেছে।

বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে সরকারি সেবা গ্রহণে নাগরিকেরা সময়, ব্যয় ও যাতায়াতের ঝক্কি থেকে নিস্তার পেয়েছেন। যেমন, ২০২০ সালে চালু ই-পাসপোর্ট সেবা নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট প্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে দ্রুত এবং সহজ করে তুলেছে। আগে সাধারণ পাসপোর্ট তৈরি করতে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগত। এখন অনলাইনে আবেদন করে মাত্র ২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই এটি হাতে চলে আসছে।

ভূমি সেবার ক্ষেত্রে ই-মিউটেশন ২০১৮ সালে চালু হয়। আগে ভূমি নামজারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কমপক্ষে কয়েক মাস সময় লাগত। এখন এটি অনলাইনের মাধ্যমে মাত্র এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করা সম্ভব হচ্ছে। এই ডিজিটাল ব্যবস্থার ফলে দপ্তরে বারবার যাওয়ার ঝামেলা কমে এসেছে।

কর দাখিলের ক্ষেত্রে ই-ট্যাক্স রিটার্ন সম্প্রতি চালু করা হয়। আগে কর দাখিল করতে করদাতাদের অফিসে গিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হতো। এখন একজন নাগরিক অনলাইনেই কর জমা দিতে পারেন এবং পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ করতে মাত্র এক-দুই ঘণ্টা প্রয়োজন হয়।

সনদ যাচাই ও সত্যায়নের ক্ষেত্রে অনলাইন সেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপুল সময় সাশ্রয় হচ্ছে। আগে সনদ যাচাই ও সত্যায়ন করতে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লাগত এবং অনেক দপ্তরে ঘুরতে হত, যা এখন অনলাইনে স্বল্প সময়ে সম্ভব হচ্ছে।

জাতিসংঘের ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে এটুআইকে-ও বিগত দুই দশকে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবনের মাধ্যমে নাগরিক ভোগান্তি কমানোর এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। আবার সরকারি সব সেবাকেই সময়, ব্যয় ও যাতায়াত কাঠামোতে ফেলে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হচ্ছে। পরে আরও সহজীকরণের পথে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। আবার এসব সেবা থেকে যেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বঞ্চিত না হয় সেই জানালাও খোলা রাখা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্সের বৈশ্বিক এই পথযাত্রায় জাতিসংঘসহ নানা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন দেশের সরকারকে প্রেষণা দিচ্ছে। গন্তব্য এক হলেও পরিবেশ-পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিবেচনায় একেকটি দেশের পথ একেক রকম। রূপান্তরের মাত্রার তারতম্যও ভিন্ন ভিন্ন। জাতিসংঘের ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে এটুআইকে-ও বিগত দুই দশকে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়নের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে একটি ফটোফিচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের এগিয়ে চলা বর্ণনা করা যায়।

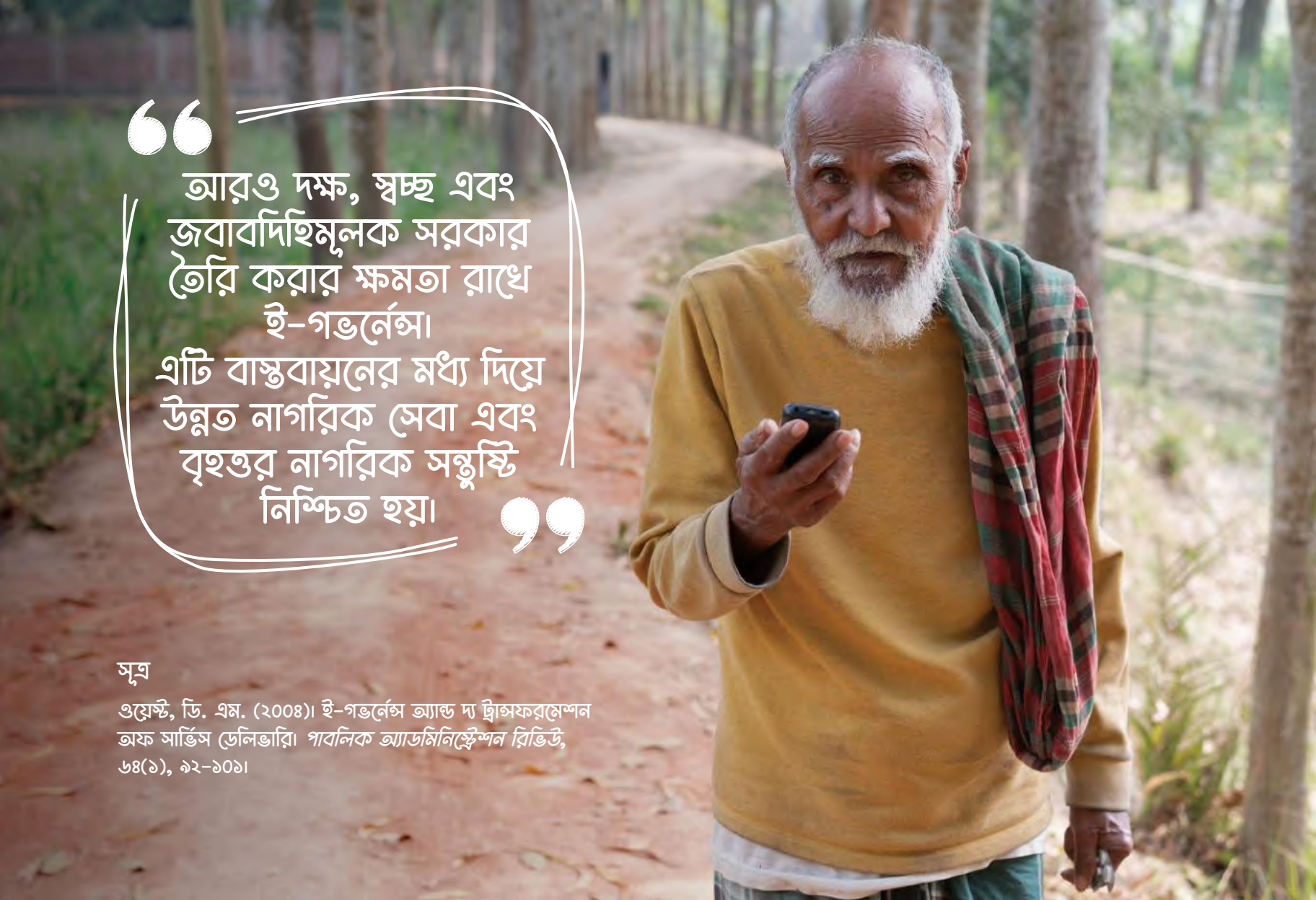

> আরও দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক সরকার তৈরি করার ক্ষমতা রাখে ই-গভর্নেন্স। এটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে উন্নত নাগরিক সেবা এবং বৃহত্তর নাগরিক সন্তুষ্টি নিশ্চিত হয়।

সূত্র

ওয়েস্ট, ডি. এম. (২০০৪)। ই-গভর্নেন্স অ্যান্ড দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ সার্ভিস ডেলিভারি। *পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিভিউ*, ৬৪(১), ৯২-১০১।

সকল
সেবা এক
প্ল্যাটফর্মে
প্রতিনিয়ত
বাড়ছে
সেবার সংখ্যা
সত্যায়ন
লাইসেন্স
নবায়ন
নিবন্ধন
সনদ
সার্টিফিকেট
আবেদন
প্রত্যায়ন
অনুমোদন
শতাধিক
সেবা যুক্ত

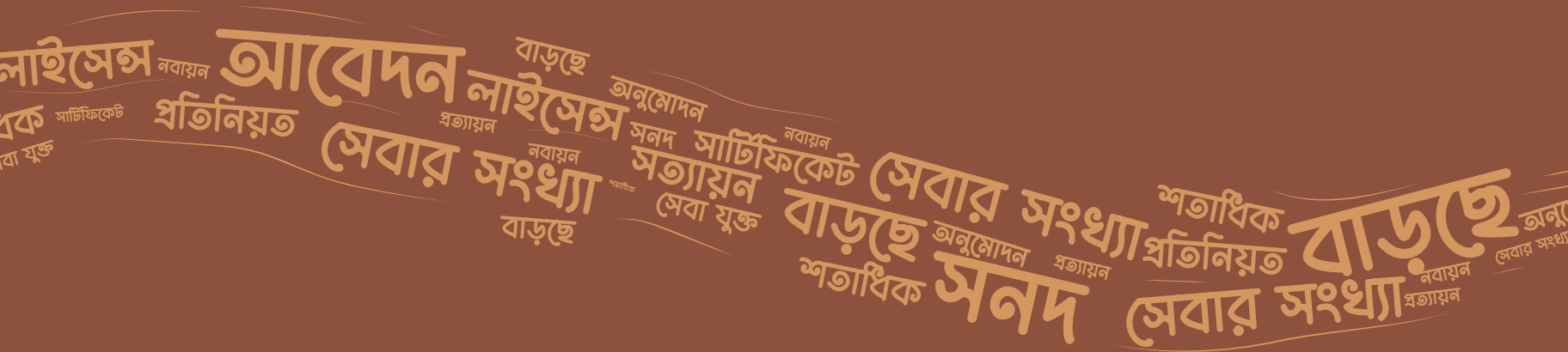

মাইগভ: এক ঠিকানায় সরকারি সেবা

নাগরিকদের সরকারি সেবা গ্রহণে আগে নানামুখী সংকটে পড়তে হতো। যেমন, সেবার তথ্য পাওয়া, ফর্ম সংগ্রহ ও পূরণ, আবেদন ও ফি জমা, অভিযোগ ও প্রতিকার, সেবা গ্রহণ সম্পর্কিত ফিডব্যাক ইত্যাদির কাজ ছিল জটিল, ক্লান্তিকর এবং সময় সাপেক্ষ। ই-গভর্নেস বাস্তবায়নে সরকারি দপ্তরগুলোতে ধাপে ধাপে প্রযুক্তিভিত্তিক সেবাদানের কাজ শুরু হয়ে যায়।

নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন সরকারি সেবা এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হচ্ছে মাইগভ প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে। সরকারের সকল দপ্তরের নাগরিক সেবাকে মাইগভ-এ যুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান। এই প্ল্যাটফর্মে নাগরিকেরা একবার নিবন্ধন করেই সেবার আবেদন থেকে শুরু করে সেবা প্রাপ্তি পর্যন্ত সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

ভবিষ্যতে, সেবার মান উন্নয়নের সাথে সাথে মাইগভ-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত করারও সুযোগ রয়েছে। তবে সরকারি সেবাসমূহের এন্ড-টু-এন্ড ডিজিটাইজেশন এবং সেবা ডিজিটাইজেশনে মন্ত্রণালয়গুলোকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের দিকে নিয়ে যাওয়া এর মূল চ্যালেঞ্জ।

ডি-নথিঃ পরিচালনা ও সিদ্ধান্তে গতি

এই শতকের শুরুতেও সরকারি দপ্তরে সামান্য কোনও তথ্য, ফর্ম, বা নথি পেতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হতো। একটি কাগজের পেছনে বছরের পর বছর ছোটাও বিচিত্র ঘটনা ছিল না। অনেক সময়ই কাগজপত্র হারিয়ে যেত, জরাজীর্ণ হয়ে পাঠযোগ্য থাকতো না। অগোছালো কাগজপত্র খুঁজে বের করতে সরকারি কর্মচারীদের যেমন পরিশ্রম করতে হত, তেমনি অসাধু অনেকেই আবার এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে নাগরিক হয়রানি করতেন। সরকারি দপ্তরে কাজ আছে মানে দীর্ঘ প্রস্তুতি আর মাসের পর মাস অপেক্ষা!

অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রথমে ই-ফাইলিং, পরবর্তীতে ই-নথি এবং আরও উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় রূপান্তর হয়েছে ডি-নথিতে। ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সরকারি দপ্তরে কাগজবিহীন, আন্তঃসংযুক্ত, স্বচ্ছ ও দ্রুত, যেকোনো স্থান ও সময়ে ফাইল নিষ্পত্তির সুযোগ করে দিয়েছে। এতে সরকারি কাজে যেমন গতি বেড়েছে, তেমনি সময়, ব্যয় ও ভোগান্তিও কমেছে।

ভবিষ্যতে, এর সঙ্গে ক্লাউড স্টোরেজ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডাটা অ্যানালিটিক্স যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। সকল সরকারি দপ্তরকে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উন্নত করার কার্যক্রম চলমান।

জাতীয় তথ্য বাতায়ন: সকল তথ্য ও সেবা এক ঠিকানায়

নাগরিকদের কাছে সরকারি সেবার তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বিষয়ে সঠিক ধারণার অভাব ছিল। এর আগে তথ্যের জন্য দপ্তরে দপ্তরে ঘুরতে হতো। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরের পরও কিছু সমস্যা থেকেই যায়। নাগরিকদের অনেকেই জানতেন না, তার চাহিদানুযায়ী নির্দিষ্ট তথ্যটি কোথায় গেলে পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার হিসেবে জাতীয় তথ্য বাতায়নে সরকারি দপ্তর ও সংস্থাগুলোর হালনাগাদ তথ্য, খবর, এবং বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাওয়া যায়। এর মূল লক্ষ্য নাগরিকদের কাছে সহজে তথ্য ও সেবা পৌঁছানো। স্ব স্ব দপ্তর হালনাগাদের সকল কার্যক্রম করে এবং নিজেদের ওয়েবসাইট সাজিয়ে নিতে পারে জাতীয় তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে।

এর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক স্ব-স্ব দপ্তরের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ নিশ্চিত করা।

জাতীয় তথ্য বাতায়ন
ভিজিট করতে স্ক্যান করুন

নাগরিক-কেন্দ্রিক সেবা
কেন্দ্রীয় তথ্য
প্রাপ্তির স্থান
তথ্যের সহজলভ্যতা
জবাবদিহিতার বৃদ্ধি
ই-গভর্নেন্সের সহজীকরণ
তথ্য ভান্ডার
পাসপোর্ট
স্বাস্থ্য সেবা
ভিসা ও ইমিগ্রেশন
আয়কর
অনলাইন নিবন্ধন
নতুন ভোটার নিবন্ধন
টিকেট বুকিং ও ক্রয়
কৃষি সংক্রান্ত তথ্য

জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩
তথ্য ও সেবা সবসময়

গত দশকের শেষেও ইন্টারনেট সেবার আওতার বাইরে থাকা দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সরকারি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে ভোগান্তি ছিল। অনেকেই আছেন তথ্যপ্রযুক্তি সেবা কীভাবে পেতে হয় সেটাই জানেন না। আবার অনেকেরই স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাতে দেখা গেল, ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পথেও অন্য ধরনের বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। এটিই ডিজিটাল ডিভাইড।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে সরকারি সেবাদানে চালু করা হয় জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩। এই নম্বরে কল করে সরকারি সেবার তথ্য ও সেবার সহযোগিতা, সামাজিক সমস্যার প্রতিকারে অভিযোগ প্রদান এবং সরকারি কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগের তথ্য পাওয়া যায়। এই হেল্পলাইন দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের একটি মাধ্যম। বন্যা কিংবা ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে উদ্ধার তৎপরতায় কিংবা ত্রাণ সরবরাহে এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে সহযোগিতা নেওয়া যায়।

ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযুক্তি, সেবার মান উন্নয়ন, সেই সাথে স্থানীয় ভাষা যোগ করার সুযোগ রয়েছে। হেল্পলাইনটিকে আরও জনবান্ধব করার জন্য প্রয়োজন নাগরিকের সেবা নিশ্চিত ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তরকে উদ্যমী হওয়া ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ডিজিটাল সেন্টার: জনগণের দোরগোড়ায় সেবা

গ্রামীণ ও প্রান্তিক নাগরিকদের সরকারি সেবা পেতে অনেক সময় লাগত। পাশাপাশি যাতায়াত করতে হতো অনেকবার। এছাড়াও প্রান্তিক জনগণের কাছে অনলাইনে সরকারি সেবা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডিভাইস, কানেক্টিভিটি এবং সক্ষমতার অভাবও ছিল। তাই ইউনিয়ন পর্যায়কে 'কমিউনিটি হাব' ধরে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। এই কেন্দ্রগুলোকে পরবর্তীতে 'ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার' (ইউডিসি) নামকরণ করা হয়। নাগরিকদের চাহিদা অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডেও এই ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু হয়। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের তখন নাম হয় 'ডিজিটাল সেন্টার'।

ইউনিয়ন পর্যায়ে এই মডেল স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি প্রযুক্তিভিত্তিক সেবাকে প্রান্তিক জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তাও তৈরি হয়েছে। এছাড়া এতে এজেন্ট ব্যাংকিংসহ নানা আর্থিক সেবার সুযোগও তৈরি হয়েছে।

ডিজিটাল সেন্টারে কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) শ্রেণিভুক্ত প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের ঋণ, বিনিয়োগ ও প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সেবাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বিদেশে গমনেচ্ছু নাগরিকদের অধিকাংশই প্রান্তিক, যাদের প্রযুক্তির ব্যবহার ও সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। তাদের জন্যই ডিজিটাল সেন্টারে প্রবাসী হেল্পডেস্কের যাত্রা শুরু। প্রান্তিক তরুণদের তথ্যপ্রযুক্তি ও পেশাগত দক্ষতা এবং কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ডিজিটাল সেন্টার কাজ করছে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ
অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
মোবাইল আর্থিক পরিষেবা
ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং ইমেল
পরীক্ষার ফলাফল এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি
সরকারি ফর্ম এবং আবেদন
ইউটিলিটি বিল পরিশোধ
প্রিন্টিং, স্ক্যানিং এবং ফটোকপি
কৃষি তথ্য
চাকরির তথ্য
ভিসা আবেদন
ভূমি সংক্রান্ত সেবা
সুরক্ষা কর্মসূচি
স্বাস্থ্য পরামর্শ

প্রবাসী হেল্পডেস্কঃ প্রবাসীর জন্য এক ঠিকানায় সকল সেবা

ভিসা, ওয়ার্ক পারমিটসহ
অভিবাসন-সম্পর্কিত তথ্য প্রদান

স্থানীয় আইন, রীতিনীতি এবং পদ্ধতি
সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান

সরকারি সংস্থা বা অন্যান্য সংস্থার সাথে
সমস্যা সমাধানে সহায়তা

বিরোধে যোগাযোগ এবং
মধ্যস্থতায় সহায়তা

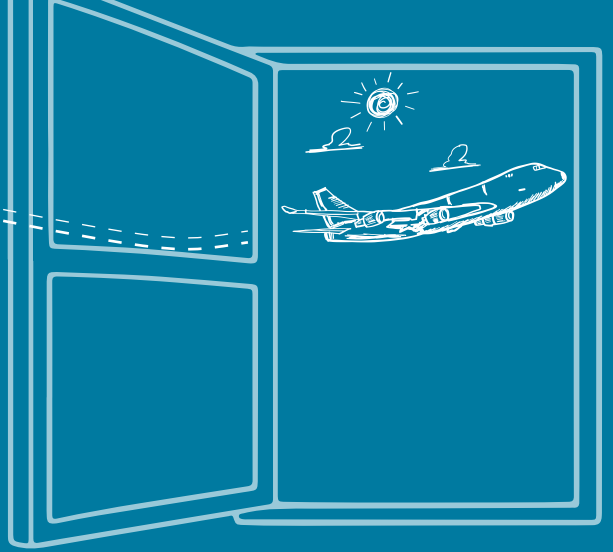

দুর্ঘটনা, অসুস্থতা বা আইনি সমস্যাসহ
জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা

বিমানবন্দরে আগমন এবং
প্রস্থান প্রক্রিয়াতে সহায়তা

পুলিশ সম্পর্কিত সমস্যায় সহায়তা

প্রান্তিক নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়ন

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিজিটাল আর্থিক সেবায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০২২ সালে চালু হয় সাথী নেটওয়ার্ক। প্রান্তিক নারীদের অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক খাতের (ব্যাংকিং ও এমএফএস) সঙ্গে যুক্ত নন। প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক খাতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সাথী নেটওয়ার্ক কাজ করে যাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টারের ১০০ জন নারী উদ্যোক্তা নিয়ে এই নেটওয়ার্কের যাত্রা শুরু হলেও সারা দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী উদ্যোক্তাকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান।

ব্যাংকিং এবং মোবাইল আর্থিক সেবা
গ্রামীণ নারীদের ডিজিটাল ও আর্থিক জ্ঞান বৃদ্ধি
আর্থিক সেবার প্রাথমিক ধারণা
অনলাইনে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি
ই-কমার্সের সুযোগ সৃষ্টি

ভূমি সেবায় সহজে অধিকার প্রাপ্তি

সরকারিভাবে জরিপ করা জমিজমার বিবরণ দলিলই ‘খতিয়ান’, যাতে থাকে মৌজার দাগ অনুসারে ভূমির মালিকের নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, মালিকানার বিবরণ, জমির বিবরণ, মৌজা নম্বর, সীমানা ইত্যাদি তথ্য। আর এই খতিয়ানের অনুলিপিকে বলা হয় পর্চা। জমি কেনাবেচা, জমি রক্ষণাবেক্ষণ ও দখলে রাখার ক্ষেত্রে পর্চা প্রয়োজন হয়। এটি সংগ্রহের জন্য নাগরিকরা বিভিন্ন হয়রানি, আর্থিক ক্ষতি এবং সময় ক্ষেপণের মুখোমুখি হতেন।

কিন্তু এখন সরকারি দপ্তরে না গিয়েও অনলাইনে আবেদন করেই ই-পর্চা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। শুরুতে অনলাইন খতিয়ান সেবা চালু হয়। পরে সেটিকে উন্নত করে ইলেকট্রনিক ল্যান্ড রেকর্ড সার্ভিস (ইএলআরএস) সিস্টেমের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চার আবেদন গ্রহণ ও প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়। এই উদ্ভাবনের সফলতার জের ধরে ভূমি রেকর্ড (খতিয়ান)-কে ডিজিটাল করতে তৈরি হয় ‘ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ডরুম সার্ভিস’। রূপান্তরের পথে ভূমি অফিসের নামজারি সেবা প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কম সময়ে, কম খরচে, বিনা ভোগান্তিতে ও স্বচ্ছতার সাথে প্রদানের জন্য ই-নামজারি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি হয়।

ই-পর্চা (২০১১) এবং ই-নামজারির (২০১৭) পথরেখায় ভূমি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ভূমি সংক্রান্ত অনলাইন সেবা প্ল্যাটফর্ম ‘ভূমি তথ্য বাতায়ন’ তৈরি করেছে, যাতে নাগরিকরা নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর, ভূমি রেকর্ড ও ম্যাপ, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি ইজারা ও বন্দোবস্ত, ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা, ভূমি রাজস্ব মামলা এবং ভূমি তথ্য ব্যাংকের সেবা নিতে পারছেন। ভবিষ্যতে এর সঙ্গে ব্যাংকিং ও আয়কর, ব্লকচেইন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি যোগ করার সুযোগ রয়েছে।

ভূমি সংক্রান্ত সেবা পেতে স্ক্যান করুন

ই-নামজারি
ভূমি তথ্য ব্যাংক
অনলাইন শুনানি ব্যবস্থা
অনুলিপির জন্য অনলাইন আবেদন
ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড (ই-পর্চা)

একপে: অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা

বিভিন্ন ধরনের সরকারি সেবার বিল এবং ফি নাগরিকদের কখনও সশরীরে, কখনও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কখনওবা আবার ব্যাংকিং বা এজেন্ট পয়েন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়। ফলে নাগরিকদের অনেক ব্যাংক চ্যানেল বা একাধিক এমএফএস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে হয়। এতে নাগরিকরা ভোগান্তির শিকার হন। এই সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাস্তবায়নে উদ্ভাবনের এক পর্যায়ে দেশের প্রথম বিল ও সার্ভিস এগ্রিগ্রেটর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সরকার তৈরি করে একপে। এর ফলে ব্যাংক ও আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো খুব সহজেই তাদের গ্রাহকদের জন্য একটি সমন্বিত ডিজিটাল উপায়ে বিল এবং ফি প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

একপে বিল আদায়ে টেকনিক্যাল ইন্টিগ্রেশনে ব্যাংক, ফিনটেক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সময় ও খরচ সাশ্রয় করে। এর মধ্য দিয়ে সরকারি এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তঃলেনদেন, দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ সহজ ও ঝামেলাহীনভাবে সম্পন্নের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিল এবং সার্ভিস-এগ্রিগ্রেশন সুবিধা ছাড়াও একপে পেমেন্ট গেটওয়েতে কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ডিজিটাল ওয়ালেটসহ বিভিন্ন ধরনের পেমেন্ট চ্যানেল যুক্ত রয়েছে।

10:30
ekpay
Eng
DPDC
DESCO Prepaid
WZPDCL
PDB
NESCO Prepaid
a2i
Cabinet Division

এসএমএস এবং ইমেল বিজ্ঞপ্তি
ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা
ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা
অনলাইন মামলা স্থিতি ট্র্যাকিং
আদালতের রেকর্ডের ডিজিটাল সংরক্ষণাগার
ভার্চুয়াল কোর্ট শুনানি
অনলাইন মামলা দায়ের
আদালতের ফি অনলাইন পেমেন্ট
অনলাইন মামলা স্থিতি ট্র্যাকিং
ভার্চুয়াল কোর্ট শুনানি
অনলাইন মামলা দায়ের
এসএমএস এবং ইমেল বিজ্ঞপ্তি
ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা
অনলাইন মামলা দায়ের
কার্যতালিকার ডিজিটাল প্রদর্শন
অনলাইন মামলা স্থিতি ট্র্যাকিং
এসএমএস এবং ইমেল বিজ্ঞপ্তি
অনলাইন কার্যতালিকা
কার্যতালিকার ডিজিটাল প্রদর্শন

স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, উদ্ভাবনী ও জনমুখী বিচার বিভাগ

বিচারপ্রার্থী জনগণের মামলা সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য বিভিন্নভাবে হয়রানির অভিযোগটি বেশ পুরনো। অনেক সময় যথাযথ তথ্যের অভাবে মামলা দায়েরে বিলম্ব ঘটে কিংবা সঠিক আদালতে মামলা করা যায় না। অধিকাংশ বিচারপ্রার্থী দূর-দূরান্ত থেকে বিচারের জন্য আদালতে আসেন। ফলে তাদের হয়রানি চরম পর্যায়ে পৌঁছে।

নাগরিকদের হাতের মুঠোয় সকল বিচারিক সেবা পৌঁছে দিতে এবং দক্ষ বিচার বিভাগ গঠনে 'বিচার বিভাগীয় বাতায়ন' তৈরি করা হয়। ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিচারিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে ই-কজলিস্ট (অনলাইন কার্যতালিকা), জুডিসিয়াল মনিটরিং ড্যাশবোর্ড এবং আমার আদালত (মাইকোর্ট), উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট কার্যদিবসে আদালতে বিচারাধীন মামলার তালিকা জনগণ কিংবা বিচার সংশ্লিষ্ট যে কেউ অনলাইন কজলিস্ট-এর ওয়েবসাইট ও আমার আদালত (মাইকোর্ট) মোবাইল অ্যাপ ভিজিট করে তার মামলার সর্বশেষ তথ্যাদি পেতে পারেন। জুডিসিয়াল মনিটরিং ড্যাশবোর্ড বা বিচার বিভাগীয় ড্যাশবোর্ড-এর মাধ্যমে অধঃস্তন আদালতসমূহে বিচারাধীন এবং নিষ্পত্তি হওয়া মামলা সম্পর্কিত সকল ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ, প্রদর্শন ও সংরক্ষণ করা হয়।

বিচারপ্রার্থীসহ সর্বস্তরের জনগণ, বিচারকগণ এবং আইনজীবীবৃন্দ স্ব-স্ব প্রয়োজনে আমার আদালত (মাইকোর্ট) মোবাইল অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন। অ্যাপটির মাধ্যমে ব্যবহারকারীগণ অধঃস্তন আদালতের জন্য প্রস্তুতকৃত সকল ডিজিটাল সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারেন।

আইনের শাসন, ন্যায় বিচার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বিচার প্রশাসনের উন্নতিসহ বিচার ব্যবস্থার প্রতি নাগরিকের আস্থা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় রয়েছেন দরিদ্র ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল প্রবীণ নাগরিক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দরিদ্র গর্ভবতী নারী এবং বয়স্ক, অসুস্থ বা অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা। এদেরকে সরকার থেকে নিয়মিত ভাতা দেওয়া হয়। এছাড়াও একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা করে থাকে সরকার। আগে প্রায়ই সামাজিক নিরাপত্তা বরাদ্দ প্রাপ্তিতে বিলম্ব, মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য, ভাতাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সময়ক্ষেপণ, অযোগ্য ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির সংকট ছিল।

অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্র ও নিজস্ব মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে সঠিক ভাতাভোগী নির্বাচন, ভাতাভোগীর দ্বৈততা পরিহার, ভাতা দেওয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অনলাইনে এই ভাতা প্রদান কার্যক্রম চালু হয়।

সরকারি ভাতা সরাসরি মোবাইলে চলে আসে
বসেই কাজ হয়ে যায়
অফিসে যাওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি
টাকা চুরি বা হারানোর ভয় থেকে মুক্তি
প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ন

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও কোভিড অতিমারি মোকাবেলা

কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে– এটি ছিল দূরতম কল্পনা। মারাত্মক সংক্রামক এই রোগটি রোগীর পাশাপাশি প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে তাদের পরিচর্যাকারী এবং চিকিৎসকদের জন্যও। সেইসময় বাংলাদেশ সরকার করোনা ট্রেসার, করোনা ইনফো প্ল্যাটফর্ম, কোভিড চিকিৎসকদের অনলাইন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অনলাইন সেবা দ্রুত চালুর মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে টিকা আবিষ্কারের পর সুরক্ষা অ্যাপে নিবন্ধনের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর টিকা প্রদান কার্যক্রম ছিল আরও বড় কাজ। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে কোভিডের আগের দুই দশকে সরকারের ই-গভর্নেন্সের যাত্রাটি শুরুর কারণে। কেননা, ততদিনে প্ল্যাটফর্মগুলো প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরেও তখন যুক্ত হয় স্বাস্থ্যসেবা।

বর্তমানে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকার অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি) টিকা প্রদান কার্যক্রম জোরদার করছে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কোভিডের সময়ে চালু টেলিমেডিসিন সেবা থেকে এখনও লাখ লাখ মানুষ সহজে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ পাচ্ছেন। এই মডেলটির আধুনিকায়নও হচ্ছে। এছাড়া সামনের দিনগুলোতে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ই-এপয়েন্টমেন্ট এবং রেফারেল সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে সরকার কাজ করছে। মা, নবজাতক এবং ৫ বছরের কমবয়সী শিশুর মৃত্যুর হার, কমিউনিকেবল, নন-কমিউনিকেবল ডিজিসের রোগীর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেও অনলাইন নেটওয়ার্ক চালুর উদ্যোগ এগিয়ে চলছে।

সমবিকাশ ও উন্নয়ন

বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের মূল লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, যেখানে প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমান সুযোগ দেওয়া হয়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাও একই কথা বলে। প্রতিবন্ধী নাগরিকের জন্য অ্যাক্সেসিবল ডিকশনারি, মাল্টিমিডিয়া ও ডিজিটাল টকিং বুকের মতো বিশেষ প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে। ডিজঅ্যাবিলিটি ইনোভেশন ল্যাব প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে, এবং ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে তাদের জন্য বিশেষ সেবা চালু আছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে এজেন্ট ব্যাংকিং ও ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন-এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসডিজি ট্র্যাকার ব্যবহার করে দেশের উন্নয়নের অগ্রগতি পরিমাপ করা হচ্ছে। তবে, ডিজিটাল বৈষম্য একটি বড় সমস্যা, কারণ এখনও বহু মানুষ ইন্টারনেট সুবিধার বাইরে, ফলে তাদের কাছে সরকারি সেবা পৌঁছানো বেশ কঠিন।

> “সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিজিটাল বিভাজন দূর করা অপরিহার্য।”

সূত্র

ওইসিডি, (২০০১)। *দ্য ডিজিটাল ডিভাইড: এ রিপোর্ট অন দ্য ওইসিডি প্রজেক্ট*। লন্ডন: ওইসিডি পাবলিশিং।

কেস স্টাডি

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নাগরিক ইমরান স্থানীয় এক ব্যাংকে ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করেন। সকল শর্ত পূরণের পরেও তাঁর আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। পরে তিনি সেই ব্যাংকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক সেই আবেদন আমলে নেয়। মোবাইল ব্যাংকিং বা প্রচলিত ব্যাংকিং পরিষেবাগুলোতে প্রতিবন্ধী নাগরিকদের জন্য অভিগম্যতা তৈরি করা হয়। ফলে দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়। এর মধ্য দিয়ে ইমরান তাঁর ক্রেডিট কার্ড হাতে পান।

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার দেবনগর ইউনিয়নের বিধবা নারী জমিলা খাতুন (রূপক)। সম্পত্তি বলতে শুধু একটি বাড়ি আছে তার। তার সন্তানেরা শহরে পাড়ি জমিয়েছে। জমিলা তার সব কাজ নিজেই করেন। তবে বয়স বেড়ে যাওয়ার কারণে দৌড়-ঝাঁপের কাজগুলো ভালোভাবে করতে পারেন না। বিশেষ করে বাড়ির খাজনা দেয়া, গ্যাস বিল জমা ইত্যাদি কাজগুলো। জমিলা খাতুনের মত এমন নাম না জানা আরও বহু নাগরিকের দুর্ভোগ নিরসনে পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন চালু করে ক্যাশলেস ইউপি সেবা সিস্টেম, যার মাধ্যমে নাগরিকেরা মোবাইল ব্যাংকিং এবং অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সেবার ফি পরিশোধ করতে পারে। জেলা প্রশাসনের এমন উদ্যোগে জমিলা খাতুনের এখন আর ব্যাংক থেকে টাকা তুলে দপ্তর ঘুরে ঘুরে বিল পরিশোধের দুর্ভোগ পোহাতে হয় না। কোনো দালালের শরণাপন্নও হতে হয় না। তিনি ঘরে বসেই এখন মোবাইলের মাধ্যমেই সব কাজ শেষ করতে পারেন।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। ন্যাশনাল সার্ভে অন পার্সনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিজ (এনএসপিডি) ২০২১ অনুসারে, দেশের প্রায় ২ দশমিক ৮০ শতাংশ, অর্থাৎ ৪৭ লাখ ৪২ হাজার নাগরিক কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন।

নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভাবনের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারি সেবা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকেও মোকাবেলা করতে হচ্ছে। 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' (এসডিজি) বা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'য় ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন এবং ইনক্লুসিভ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে জাতিসংঘ।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। ন্যাশনাল সার্ভে অন পার্সনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিজ (এনএসপিডি) ২০২১ অনুসারে, দেশের প্রায় ২ দশমিক ৮০ শতাংশ, অর্থাৎ ৪৭ লাখ ৪২ হাজার নাগরিক কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)-এর মতে, এই সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

এসডিজির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি দুস্থ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথাও সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। সেই লক্ষ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন এবং ডিজিটাল সেবায় তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য নানাবিধ প্রযুক্তি ও প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাষাগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য 'অ্যাক্সেসিবল ডিকশনারি'র কথা বলা যেতে পারে। এটি দ্বারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রয়োজনীয় শব্দ, সঠিক উচ্চারণ ও বাক্যের অর্থ জানতে পারছেন। এছাড়া, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য 'মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক' চালু করা হয়েছে, যা তাদের শিক্ষার সুযোগকে আরও বিস্তৃত করেছে।

> “ডিজিটাল বিভাজন শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা নয়, বরং উন্নত দেশগুলোর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্যও একটি সমস্যা।”

সূত্র

নরিস, পি. (২০০১)। *ডিজিটাল ডিভাইড: সিভিক এনগেজমেন্ট, ইনফরমেশন পোভার্টি, অ্যান্ড দ্য ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডওয়াইড* কেমব্রিজ, ইংল্যান্ড: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

‘ডিজঅ্যাবিলিটি ইনোভেশন ল্যাব’ (ডিআইএল) আরেকটি বড় উদ্যোগ, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবন তৈরি করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজে সরকারি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে বিশেষ সেবা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতিবন্ধী ও দুস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সুরক্ষা এবং সামাজিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ‘এজেন্ট ব্যাংকিং’ এবং ‘ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন’-এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

> ২০০০ সালে গৃহীত এমডিজিতে ৮টি প্রধান লক্ষ্যের শেষটি ছিল ‘গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট’ অর্থাৎ বৈশ্বিক উন্নয়ন অংশীদারিত্বের সম্প্রসারণ। এই লক্ষ্যটির অনুষঙ্গ হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ইন্টারনেটের প্রসার, টেলিযোগাযোগ সুবিধা উন্নয়ন, এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জাতিসংঘের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালে মোট ১৭টি লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়। এর লক্ষ্য ৯ (শিল্প, উদ্ভাবন, ও অবকাঠামো) ও ১৬-তে (শান্তি, ন্যায়বিচার, ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান) তথ্যপ্রযুক্তি এবং ই-গর্ভনেন্সের ভূমিকার কথা সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া এসডিজির ৩ থেকে ৬, ১০, ১৫ এবং ১৭ নম্বর লক্ষ্য পূরণেও পরোক্ষভাবে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসডিজি ট্র্যাকার

এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি বুঝতে তথ্য-উপাত্ত দৃশ্যমান করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে নিয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন ও এসডিজি ট্র্যাকারের ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। এসডিজি ট্র্যাকার চালুর ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে আইসিটি বিভাগের এটুআই-এর ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এসডিজির ১৭টি বড় পরিসরের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি লক্ষ্যের ভেতর আবার ছোট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বা টার্গেট রয়েছে। মোট ২৩১টি মৌলিক সূচক দিয়ে এগুলো পরিমাপ করা হয়।

প্রতিটি দেশই তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা, রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার ও চাহিদা এবং আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার আলোকে এসডিজি সূচকের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করেছে। এটি হলো বৈশ্বিক অগ্রাধিকারের আলোকে জাতীয় অগ্রাধিকার কৌশল।

বৈশ্বিক প্রয়োজন, চাহিদা এবং অধিকারকে স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকে সাজিয়ে নেওয়াই হলো ‘এসডিজি স্থানীয়করণ’।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এসডিজির ১৭টি বড় পরিসরের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি লক্ষ্যের ভেতর আবার ছোট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বা টার্গেট রয়েছে। মোট ২৩১টি মৌলিক সূচক দিয়ে এগুলো পরিমাপ করা হয়।

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে এসডিজির স্থানীয়করণ কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করে। এসডিজি স্থানীয়করণে উপজেলাকে সর্বশেষ ইউনিট ধরে জাতীয় পর্যায়, জেলা পর্যায় এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অংশগ্রহণে ৩৯ + ১ মডেল আত্তীকরণ করা হয়, যা 'বাংলাদেশ মডেল' নামে পরিচিত।

'এসডিজি ট্র্যাকার'-এর মাধ্যমে সরকার, নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং নাগরিকেরা এসডিজির বিভিন্ন বৈশ্বিক বা স্থানীয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানতে পারেন। এই উদ্যোগটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং এসডিজি অর্জনে সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে। এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও বাংলাদেশের এসডিজি বাস্তবায়নের চিত্র তুলে ধরে।

'এসডিজি ট্র্যাকার' এর মাধ্যমে সরকার, নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং নাগরিকেরা এসডিজির বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানতে পারেন।

জাতিসংঘের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাগুলো জানতে স্ক্যান করুন

এসডিজি ট্র্যাকার সম্পর্কে জানতে স্ক্যান করুন

ডিজিটাল বৈষম্য

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বাংলাদেশও বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত রূপান্তরের সাথে সঙ্গতি রাখার চেষ্টা করছে। তবে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি হলেও রাষ্ট্রের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাগরিকেরা যদি সেটিকে ব্যবহার করে সেবা গ্রহণের সুযোগ না পান, তাহলে ডিজিটাল বৈষম্য কমার বিপরীতে বৃদ্ধির শঙ্কাই বেশি।

> ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মানসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রযুক্তির অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেটি অন্তর্ভুক্তিমূলক করাটাও বিভিন্ন দেশের সরকারের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্যমতে, ২০২৪ সালের নভেম্বর নাগাদ ভিন্ন ভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিলেন ১৩ কোটি ২৮ লাখ। এর মধ্যে মোবাইল ফোন দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিলেন ১১ কোটি ৯০ লাখের কিছু বেশি। আর ১ কোটি সাড়ে ৩৭ লাখ মানুষ ব্রডব্যান্ড ও পিএসটিএন দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন।

ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা থেকেই যদি নাগরিকেরা বঞ্চিত থাকেন, তাহলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াও বেশ জটিল।

কিন্তু এই সংখ্যা দিয়ে প্রকৃত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বুঝা যাবে না। কেননা, একই নাগরিক ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ডিভাইস যেমন ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি একই ডিভাইস দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ইন্টারনেট কানেকশনের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে পারেন।

২০২৪ সালের মার্চে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'ডিজিটাল অগ্রগতি ও প্রবণতা প্রতিবেদন ২০২৩'-এ উঠে এসেছে যে, বাংলাদেশে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৩৯ জন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের শ্রেণিভুক্ত। এই শ্রেণিভুক্ত দেশগুলোতে গড়ে জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। দক্ষিণ এশিয়ায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর গড় হার ৪২ শতাংশ।

ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা থেকেই যদি নাগরিকদের বড় অংশ বঞ্চিত থাকেন, তাহলে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াও বেশ জটিল হবে বৈকি।

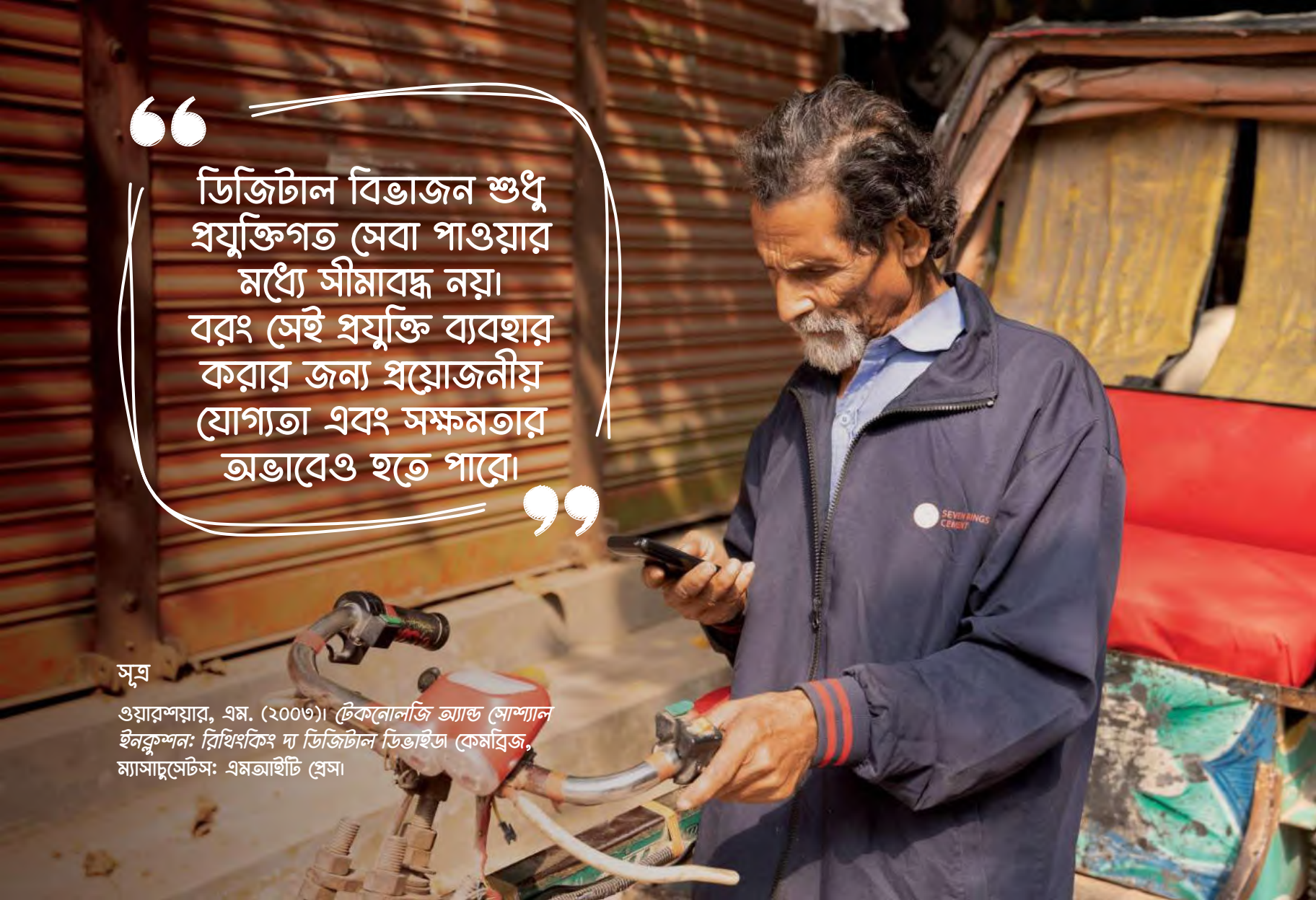

“ডিজিটাল বিভাজন শুধু প্রযুক্তিগত সেবা পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং সক্ষমতার অভাবেও হতে পারে।”

সূত্র

ওয়ারশয়ার, এম. (২০০৩)। *টেকনোলজি অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন: রিথিংকিং দ্য ডিজিটাল ডিভাইড* কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস: এমআইটি প্রেস।

রূপান্তরের বিশ্বমঞ্চে

জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (ইজিডিআই), গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স (জিআইআই) এবং বিশ্বব্যাংকের গভটেক ম্যাচুরিটি ইনডেক্স (জিটিএমআই) অনুযায়ী, বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে। এসব সূচকে নিজেদের অবস্থান রাতারাতি শীর্ষ সারিতে নিতে না পারলেও, ধারাবাহিক উন্নতির ছাপ রেখেছে বাংলাদেশ।

অনলাইন সেবা ও টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর অগ্রগতির কারণে ইজিডিআই ২০২৪-এ বাংলাদেশের অবস্থান আগের চেয়ে এগিয়েছে। জিআইআই সূচকে বলছে, গবেষণা, স্টার্টআপ বৃদ্ধি ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ রূপান্তরের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েই এগোচ্ছে। জিটিএমআই সূচক অনুযায়ী, বাংলাদেশ ডিজিটাল গভর্নেন্সে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে। এই সূচকে সরকারি সেবার প্রযুক্তিগত রূপান্তর, অনলাইন পেমেন্ট, সামাজিক সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম ও আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নের প্রশংসা করা হয়েছে।

তবে তিনটি আন্তর্জাতিক সূচকেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণায় বিনিয়োগ, সাইবার নিরাপত্তা এবং নীতিগত সহায়তা জোরদারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইজিডিআই ইনডেক্সে ২০২৪ সালে ১৯৩টি দেশের ই-গভর্নমেন্ট-এর অবস্থা তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ এই ইনডেক্সে ১০০তম স্থানে রয়েছে। ২০২০ এবং ২০২২ সালে এই ইনডেক্সে যথাক্রমে ১১৯ এবং ১১১তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ।

ইজিডিআই রিপোর্ট পড়তে স্ক্যান করুন

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ইজিডিআই বৈশ্বিক সূচকটি তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে: অনলাইন পরিষেবা, টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো এবং মানবসম্পদ। ইজিডিআই ইনডেক্সে ২০২৪ সালে ১৯৩টি দেশের ই-গভর্নমেন্ট-এর অবস্থা তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ এই ইনডেক্সে ১০০তম স্থানে রয়েছে। ২০২০ এবং ২০২২ সালে এই ইনডেক্সে যথাক্রমে ১১৯ এবং ১১১তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। অর্থাৎ ধারাবাহিক উন্নতি হয়েছে। ২০২৪ সালের ইজিডিআই 'টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো' সূচকে বাংলাদেশের পয়েন্ট ছিল ০.৬৫০১। এর আগে প্রকাশিত ইনডেক্সে অর্থাৎ ২০২২ সালে ০.৪৪৬৯ পয়েন্ট পেয়েছিল। এছাড়া, 'অনলাইন সেবা সূচক'-এ বাংলাদেশ স্কোর করেছে ০.৭৩৭৪, যা আগে ছিল ০.৬৫২১। এর সরল অর্থ হচ্ছে মধ্যবর্তী সময়ে সরকারের প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের পরিসর বেড়েছে।

জিআইআই সূচক নির্ধারণে বিবেচনা করা হয়– প্রতিষ্ঠান, মানব পুঁজি ও গবেষণা অবকাঠামো, ক্রেডিট সহজলভ্যতা, ব্যবসা অনুশীলন, জ্ঞান ও প্রযুক্তি আউটপুট এবং সৃজনশীল পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন। এই সূচকে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০৬। মূল সূচকের ভেতরে মোট ৮০টি উপ-সূচক নিয়ে জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন (ডব্লিউআইপিও) জিআইআই সূচক তৈরি করে।

তৃতীয় আরেকটি বৈশ্বিক সূচক হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের জিটিএমআই। প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো দেশের সরকার কী পরিমাণ দক্ষতা অর্জন করতে ও নাগরিক সেবা দিতে পারছে, সেটি এই সূচকে পরিমাপ করা হয়। সরকারি ক্লাউড অবকাঠামো, আন্তঃসংযোগ ফ্রেমওয়ার্ক এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সরকারি কার্যক্রমের দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা, সরকারি অনলাইন সেবার মান, ই-পেমেন্ট সিস্টেম, সামাজিক সুরক্ষা প্ল্যাটফর্মগুলোর দক্ষতা, ইত্যাদি জিটিএমআই সূচকে প্রাধান্য পায়।

“ডিজিটাল বিভাজন সমস্যাটি জটিল এবং বহুমাত্রিক, যার মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ, সামর্থ্য এবং দক্ষতা।”

সূত্র

ভ্যান ডাইক, জে.এ.জি.এম. (২০০৬)। ডিজিটাল ডিভাইড রিসার্চ, অ্যাচিভমেন্টস অ্যান্ড শর্টকামিংস। *পোয়েটিক্স*, ৩৪(৪-৫), ২২১-২৩৫।

জিটিএমআই-২০২২ রিপোর্টে বাংলাদেশ ডিজিটাল গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে ১৯৮টি অর্থনীতির মধ্যে গ্রুপ 'এ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি সেবাগুলোকে প্রযুক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে নাগরিকের কাছে পৌঁছানোয় শীর্ষ পর্যায়ের দেশগুলোর সারিতে বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়েছে।

২০২২ সালে বাংলাদেশের গড় গভটেক ম্যাচুরিটি স্কোর ছিল ০.৫৫২, যেখানে গ্রুপ 'এ' এর দেশগুলো ০.৭৫ থেকে ১.০০ স্কোর অর্জন করেছে। ইজিডিআই, জিআইআই কিংবা জিটিএমআই– তিন সূচকেই বাংলাদেশের দৃশ্যমান অগ্রগতি রয়েছে।

অগ্রগতির তথ্য জানানোর পাশাপাশি তিন সূচকেই বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তর এবং উদ্ভাবনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে উন্নতির ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো বাড়ানোর পাশাপাশি মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরও প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রোগ্রাম চালুর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া বেসরকারি খাতে উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করতে নীতি প্রণয়ন, অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি এবং গভটেক স্টার্ট-আপে সহযোগিতা বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে, নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে সহজ ও জনবান্ধব অনলাইন সেবা চালু এবং এসব প্ল্যাটফর্মে নাগরিকদের মতামত নেওয়ার প্রক্রিয়া আরও উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার কথা এসেছে। সাইবার নিরাপত্তা কাঠামো শক্তিশালী করা এবং আইন প্রয়োগে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করাও অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অগ্রগতির তথ্য জানানোর পাশাপাশি তিন সূচকেই বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তর এবং উদ্ভাবনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে উন্নতির ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো বাড়ানোর পাশাপাশি মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরও প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রোগ্রাম চালুর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

জিটিএমআই রিপোর্ট পড়তে স্ক্যান করুন

তুলনা মূলক নাকি অমূলক

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ই-গভর্নেন্স-এর কথা বললেই যে কয়েকটি দেশের নাম আসে তার মধ্যে অন্যতম ইউরোপের এস্তোনিয়া এবং এশিয়ার সিঙ্গাপুর। ই-গভর্নমেন্ট ইনডেক্সের শীর্ষে ধারাবাহিকভাবে অবস্থান বজায় রাখা দেশগুলোর সঙ্গে অতি অবশ্যই বাংলাদেশের তুলনা করাটি অনেকের কাছে অসমীচীন মনে হতে পারে। তবু এস্তোনিয়া ও সিঙ্গাপুরে ই-গভর্নেন্সে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় নানা ধাপ দেখলে হয়তো তুলনামূলক নাকি অমূলক সেটি বুঝা যাবে।

এস্তোনিয়া

গত শতকের নব্বই দশকে এস্তোনিয়া যখন স্বাধীন হয়, তখন দেশটি ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সবদিক থেকেই অনেক পিছিয়ে ছিল। ১৯৯৭ সালে, অনলাইনে সরকারি সেবা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ নির্মাণের পথে যাত্রা শুরু করে এস্তোনিয়া।

'ইন্টারনেট সেবা'কে নাগরিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা দিয়ে এস্তোনিয়া সরকার ২০০২ সালের মধ্যেই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করে। এর ঠিক এক দশক পরে, সরকারি কার্যক্রমের প্রায় ৯০ শতাংশ অনলাইনে চালু করে দেশটি। এতে একদিকে সরকারি অফিসগুলোতে কাজের দীর্ঘসূত্রিতা কমে যায়, অপরদিকে নাগরিকের কাজের গতি বাড়ে। বর্তমানে এস্তোনিয়ায় ১৫ বছরের বেশি বয়সী সকলের ইলেক্ট্রনিক আইডি কার্ড রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা ব্যাংকে অর্থ লেনদেন থেকে শুরু করে কর প্রদান এবং সবধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

'ইন্টারনেট সেবা'কে নাগরিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা দিয়ে এস্তোনিয়া সরকার ২০০২ সালের মধ্যেই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করে। এর ঠিক এক দশক পরে, সরকারি কার্যক্রমের প্রায় ৯০ শতাংশ অনলাইনে চালু করে দেশটি।

এস্তোনিয়ার ই-গভর্নেন্স-এর মেরুদণ্ড হচ্ছে 'এক্স রোড' নামের একটি ওপেন সোর্স। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগের নিরাপদ ডাটা বিনিময়ের মাধ্যম এই 'এক্স রোড'। এর মধ্য নিয়ে নাগরিকের ডিজিটাল পরিচয়, আই-ভোটিং, ই-ট্যাক্স এবং ই-বিজনেসের মতো কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে।

২০১২ সালে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এস্তোনিয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্লকচেইন প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করে। এটি এখন সংরক্ষিত ডাটার সঠিকতা, স্বচ্ছতা এবং সাইবার হুমকি প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। এস্তোনিয়া ব্যবহার করে কেএসআই ব্লকচেইন প্রযুক্তি। ডাটা সুরক্ষার জন্য এস্তোনিয়া 'ডাটা দূতাবাসে'র ধারণা তৈরি করেছে। ২০১৪ সালে এস্তোনিয়ার সরকার চালু করে 'ই-রেসিডেন্সি', যার মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো দেশ থেকে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের মাধ্যমে এস্তোনিয়ার ডিজিটাল নাগরিকত্ব লাভ করা যায়।

সিঙ্গাপুর

মালয়েশিয়া থেকে আলাদা হয়ে ১৯৬৫ সালে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে সিঙ্গাপুরের। বেকারত্ব আর আবাসন সংকটে ধুঁকতে থাকা সিঙ্গাপুর সরকার গত শতকের আশির দশকে একটি আধুনিকীকরণ কর্মসূচি শুরু করে, যার কৌশল হিসেবে বেছে নেয় প্রযুক্তিকে।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়েই 'সিঙ্গাপুর ওয়ান' নামে দেশব্যাপী প্রথম ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো তৈরি করে সিঙ্গাপুর সরকার। এটির আওতা দ্বীপ রাষ্ট্রটির ৯৯ শতাংশ জুড়ে। অর্থাৎ স্কুল, ব্যবসা, বাড়ি, লাইব্রেরি এবং কমিউনিটি সেন্টারে ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তির সক্ষমতার ভিত্তি তখনই তৈরি হয়ে যায়।

১৯৯৬ সালের জুনের মধ্যে সিঙ্গাপুর সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ৬০টিরও বেশি তথ্য সেবা পরিবেশনের ওয়েবসাইট চালু হয়। কিন্তু এগুলো স্ব-স্ব দপ্তরের সেবা দিলেও কোনো একক প্ল্যাটফর্মে ছিল না। অর্থাৎ তাদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ছিল না। নাগরিকদের একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সকল সরকারি সেবা দিতে ১৯৯৯ সালে 'ওয়ানস্টপ ই-সিটিজেন' বাস্তবায়ন শুরু করে সিঙ্গাপুর সরকার।

অবকাঠামো বিকাশের পাশাপাশি দেশটির সরকার প্রতিটি নাগরিকের ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ধারাবাহিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এমনকি প্রযুক্তিগত বৈষম্য এড়াতে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেকেন্ড-হ্যান্ড পিসি বিতরণ করতে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুর সরকারের উদ্যোগে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সংস্কৃতি বিকাশে সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে নিয়মিত সভা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত জরুরি অনুশীলন এবং উদ্ভাবনগুলো সরকারি সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে।

অবকাঠামো বিকাশের পাশাপাশি দেশটির সরকার প্রতিটি নাগরিকের ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ধারাবাহিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এমনকি প্রযুক্তিগত বৈষম্য এড়াতে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেকেন্ড-হ্যান্ড পিসি বিতরণ করতে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে সিঙ্গাপুর।

এস্তোনিয়া, সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশের ই-গভর্নেন্স সিস্টেমের সাদৃশ্য

এস্তোনিয়ার ‘এক্স রোড’ এবং ‘ওয়ানস্টপ ই-সিটিজেন’-এর মতো বাংলাদেশ সরকারও সকল সরকারি নাগরিক সেবাকে একটি একক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকারের ‘মাই গভ’ ঠিক এমনই একটি প্রচেষ্টা। এস্তোনিয়ায় স্বাস্থ্য রেকর্ড সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড এবং নাগরিকরা যেকোনো সময় সেগুলো অ্যাক্সেস করতে পারেন। বাংলাদেশেও টেলিমেডিসিন এবং অনলাইন স্বাস্থ্য সেবা চালু রয়েছে। এটি দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে ই-হেলথ কার্ডের মধ্য দিয়ে একজন নাগরিকের সরকারিভাবে প্রাপ্য সকল স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে শুরুর দিকে সিঙ্গাপুর তার ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রূপান্তরের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে যে যে সংকট মোকাবেলা করেছে, বাংলাদেশও সেইসব মোকাবেলা করেই এগোচ্ছে।

এস্তোনিয়ার ‘এক্স রোড’ এবং ‘ওয়ান-স্টপ ই-সিটিজেন’ এর মতো বাংলাদেশ সরকারও সকল সরকারি নাগরিক সেবাকে একটি একক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকারে ‘মাই গভ’ ঠিক এমনই একটি প্রচেষ্টা।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদানে বছর দশেক আগেও বাংলাদেশের এক দপ্তরের সঙ্গে অন্য দপ্তরের যোগাযোগ ক্ষীণ ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের সরকারি দপ্তরগুলো স্বতন্ত্রভাবে কেবল নিজেদের সেবাই নাগরিকদের পরিবেশন করতো। এমনকি ওয়েবসাইট কিংবা ডিজিটাল মাধ্যমে নাগরিককেন্দ্রিক সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় আড়ষ্টতা দেখা যেত। এখন আগের তুলনায় নাগরিককেন্দ্রিক সেবা দেওয়ায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সপ্রতিভ হচ্ছে, এগোচ্ছে রূপান্তরের পথে।

উন্নত বিশ্বের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ

এস্তোনিয়া ও সিঙ্গাপুরের উদাহরণ টানা হয়েছে মূলত বাংলাদেশের রূপান্তর প্রক্রিয়াটি বুঝার নিমিত্তে। এস্তোনিয়ার মোট জনসংখ্যা ১৩ থেকে ১৪ লাখ। ভৌগোলিক দিক থেকে, ইউরোপের এ দেশটির তুলনায় বাংলাদেশ আয়তনে সাড়ে ৩ গুণ বড়। বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার লোক বসবাস করেন। আর এস্তোনিয়ায় বসবাস করেন মাত্র ৪০ জন লোক! অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে এস্তোনিয়ার তুলনায় ৭৫ গুণেরও বেশি লোক বসবাস করেন। সিঙ্গাপুরেরও জনসংখ্যা মাত্র ৬০ লাখ। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশটির আয়তন ৭০০ বর্গমাইল, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেলা মেহেরপুরের সমান। সিঙ্গাপুর একটি দ্বীপরাষ্ট্র বিধায় ইন্টারনেট অবকাঠামো তৈরি সহজ।

এস্তোনিয়া এবং সিঙ্গাপুর ই-গভর্নেন্স-এর পথে যাত্রা শুরু করেছে প্রায় তিন দশক। সেখানে বাংলাদেশে এর যাত্রা শুরুর দুই দশক গিয়েছে কেবল।

এসব বিবেচনায় বাংলাদেশ কি খুব পিছিয়ে রয়েছে?

ই-গভর্নেন্সের পথে যাত্রার দুই দশকে বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য শূন্য থেকে একটি অবকাঠামো তৈরি করতে পেরেছে বাংলাদেশ। এই স্বল্প সময়ে কোটি কোটি মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম করে তোলার উদ্যোগ এখনও চলমান। ৯০ ভাগের বেশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-গভর্নেন্সের সুবিধা ইতোমধ্যেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কোভিড অতিমারীর সময়ে দেশে প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি মানুষকে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই-বাছাই করে সরকারিভাবে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

যদিও আত্মতৃপ্তিতে ভোগার কোনও সুযোগ উদ্ভাবনের সংস্কৃতিতে নেই!

বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার লোক বসবাস করেন। আর এস্তোনিয়ায় বসবাস করেন মাত্র ৪০ জন লোক! অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে এস্তোনিয়ার তুলনায় ৭৫ গুণেরও বেশি লোক বসবাস করেন।

সক্ষমতার একটি উদাহরণ: অনলাইন সনদ সত্যায়ন

আগে সনদ সত্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় যেতে হতো। এরপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং গন্তব্য দেশের কনস্যুলেট থেকে সত্যায়িত করতে হতো, যা ছিল সময়সাপেক্ষ এবং জটিল প্রক্রিয়া। এতে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেত, ঘুরতে হতো অনেক দপ্তরে। এখন অনলাইনে আবেদন করে কয়েকদিনের মধ্যেই সনদ সত্যায়ন করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ‘দ্য কনভেনশন অন অ্যাবোলিশিং দ্য রিকোয়ারমেন্ট অভ লিগালাইজেশন অব ফরেন পাবলিক ডকুমেন্ট’ বা ‘অ্যাপস্টিল কনভেনশন-১৯৬১’-এর পক্ষভুক্ত হয় ২০২৪ সালে। ১৯৬১ সালের ৫ অক্টোবর স্বাক্ষরিত এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটি ‘হেইগ কনভেনশন’ নামেও পরিচিত। এটি কোনো দেশের সরকারি নথিপত্রের (যেমন জন্ম সনদ, বিবাহ সনদ, শিক্ষা সনদ, আদালতের নথি ইত্যাদি) বৈধতা অন্য দেশে প্রমাণের প্রক্রিয়া সহজ করে। এই কনভেনশনের অধীনে, একটি দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ‘অ্যাপস্টিল’ নামের সার্টিফিকেট নাগরিকদের চাহিদার ভিত্তিতে দিয়ে থাকে। এই সার্টিফিকেটটি নিশ্চিত করে যে নথিপত্রের স্বাক্ষর, সিল বা স্ট্যাম্পটি আসল। অ্যাপস্টিলযুক্ত নথি অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রে সরাসরি ব্যবহারের জন্য বৈধ বলে গণ্য হয়।

আগে সনদ সত্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় যেতে হতো। এরপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং গন্তব্য দেশের কনস্যুলেট থেকে সত্যায়িত করতে হতো, যা ছিল সময়সাপেক্ষ এবং জটিল প্রক্রিয়া। এতে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেত, ঘুরতে হতো অনেক দপ্তরে। এখন অনলাইনে আবেদন করে কয়েকদিনের মধ্যেই সনদ সত্যায়ন করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশকে এই কনভেনশনে যোগদানে উৎসাহিত করতে এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগে নীতিমালা প্রণয়ন, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে এটুআই। এর মাধ্যমে নাগরিকেরা সহজে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং তাদের নথিপত্র ট্র্যাক করতে পারবেন। এর ফলে দেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সত্যায়ন করা কাগজপত্র আর অন্য দেশে পুনরায় সত্যায়ন করতে হবে না। আর প্রতি বছর বিদেশগামী বাংলাদেশিদের আনুমানিক ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। উৎসাহব্যঞ্জক খবর হলো, অ্যাপস্টিল কনভেনশন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিগতভাবে এই সিস্টেমটি সরকারি দপ্তরগুলোতে সমন্বিতভাবে চালু করতে পেরেছে।

University
Ministry of Education
Education Board
University
Education Board
University
Ministry of Education
Ministry of Education
Ministry of Foreign Affairs

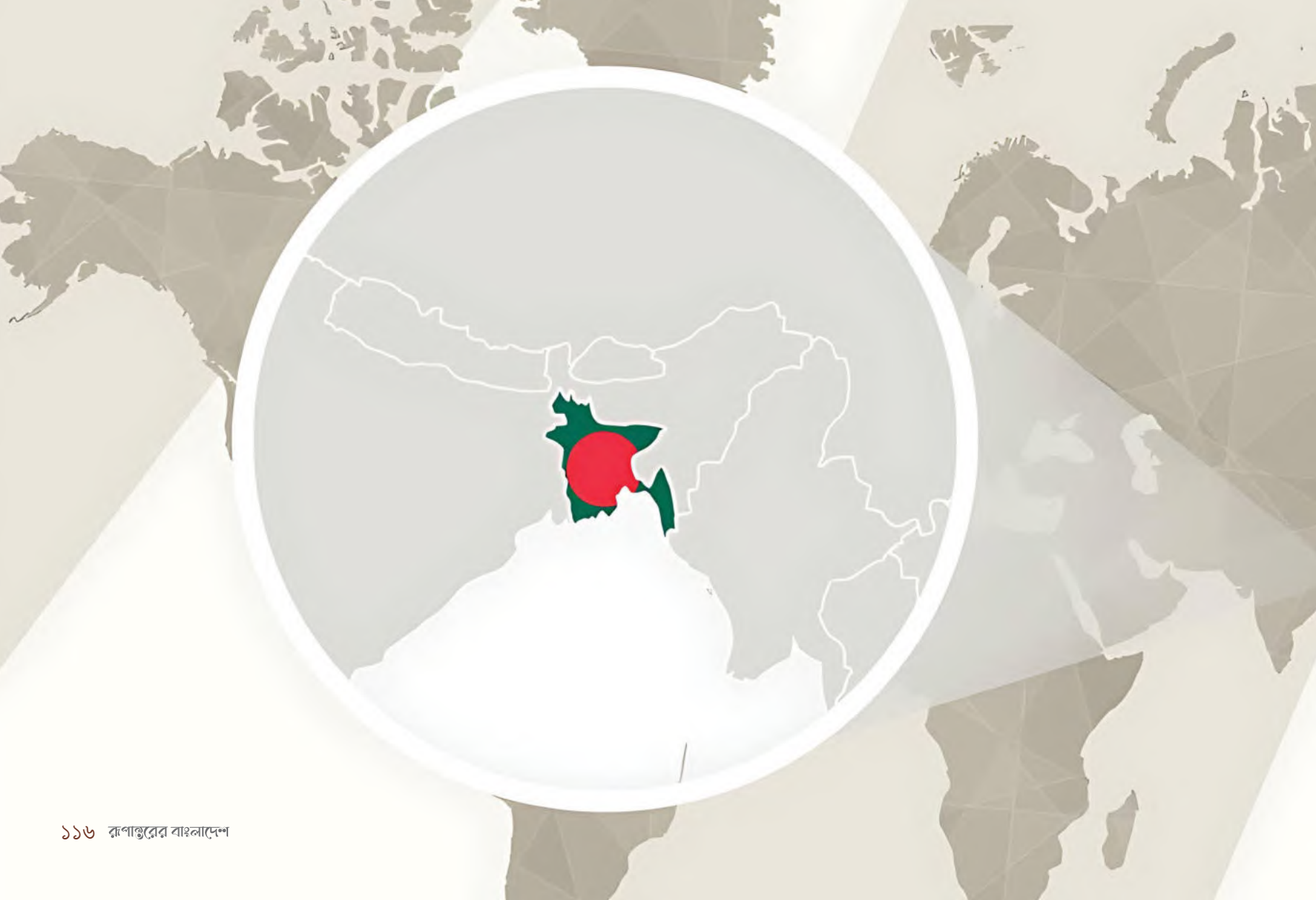

উদ্ভাবনে আন্তর্জাতিক অর্জন

সক্ষমতার বিচারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে উন্নতি করেছে। ই-গভর্নেন্স সূচকে ২০১২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫০তম। এক দশক পরে ২০২২ সালে ওই অবস্থান থেকে বাংলাদেশ ৫০টি ধাপ এগিয়েছে। মাত্র একবার বাদে সবসময়ই র‍্যাংকিংয়ে অগ্রগতি হয়েছে। এই সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অবস্থান ও বিভিন্ন প্রকল্প নানা সময়ে বৈশ্বিক বিভিন্ন মহলের প্রশংসাও কুড়িয়েছে।

২০১৮ সালের বৈশ্বিক ই-গভর্নেন্স সূচকের তিনটি প্রধান উপ-সূচকের অন্যতম অনলাইন সার্ভিস ইনডেক্স। বাংলাদেশ এই উপ-সূচকে ০.৫১ পয়েন্ট অর্জন করে এস্তোনিয়া, ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত দেশগুলোর সাথে সহ-অবস্থানে ছিল।

সাউথ সাউথ কো-অপারেশন

বাংলাদেশের উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল আইসিটি ইনোভেশন (আই-৩) ম্যাচিং ফান্ড সুবিধা চালু হয়েছে এবং ৫টি দেশকে বাংলাদেশের আইসিটি-ভিত্তিক উত্তম অনুশীলন রেপ্লিকেট করার জন্য সহায়তা দিচ্ছে।

দক্ষিণের দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময় করার লক্ষ্যে দ্য সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্ক ফর পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন নেটওয়ার্ক বিনির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে, ৩৭টি সদস্য দেশ এবং ৩০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক সংস্থা এই নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে এবং যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল আইসিটি ইনোভেশন (আই-৩) ম্যাচিং ফান্ড সুবিধা চালু হয়েছে এবং ৫টি দেশকে বাংলাদেশের আইসিটি-ভিত্তিক উত্তম অনুশীলন রেপ্লিকেট করার জন্য সহায়তা দিচ্ছে।

কাউকে পেছনে ফেলে নয়– এই মূলমন্ত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, বিভিন্ন ফাউন্ডেশনাল সফটওয়্যারসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো তৈরির পাশাপাশি নীতি সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় ইকোসিস্টেম উন্নয়নে এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব স্থাপনে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার। এর ফলে সমাজের সকল স্তরে যুব, নারী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্যোক্তা মানসিকতা তৈরি এবং দক্ষতার উন্নয়ন হয়েছে।

এই ধারাবাহিকতায়, সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া (পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি) সহজীকরণ ও সংস্কারের মাধ্যমে প্রশাসনে উদ্ভাবনের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা ও ডিজিটাল বৈষম্য মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে।

The South South Network

রেপ্লিকা ও পুরস্কার

বাংলাদেশ সরকারের নানা উদ্ভাবনী উদ্যোগ ফিলিপিনস, ফিজি, গাম্বিয়া, সোমালিয়া, সাউথ সুদান, তুরস্কসহ ৭টি দেশে রেপ্লিকেট হচ্ছে। এছাড়া সরকারের সঙ্গে ক্যাটালিস্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা এটুআই আফ্রিকা মহাদেশের ৫টি স্বল্পোন্নত দেশে উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণে কারিগরি সহযোগিতা দিচ্ছে। দেশ ও বিদেশে কাজের স্বীকৃতস্বরূপ এটুআই ডব্লিউএসআইএস, এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স, ইউএন-আইটিইউ এসডিজি গেইম চেঞ্জার অ্যাওয়ার্ড-সহ ৭৮টি পুরস্কার অর্জনের সম্মানে ভূষিত হয়েছে।

DIGITAL GAMECHANGERS AWARD
FROM SDG
2023

WASIS AWARD
WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY
2014-20

WITSA GLOBAL INNOVATION AND TECH EXCELLENCE
2014-2023

ITEX AWARD
2018-2019

APICTA AWARD
2017-19

WITSA
GLOBAL EXCELLENCE ICT AWARDS
2022

UNITED NATIONS PUBLIC SERVICE AWARD
2020

APOLITICAL GLOBAL PUBLIC SERVICE AWARDS
2019

GOVINSIDER INNOVATION AWARDS
2019

COMMONWEALTH DIGITAL AWARD
2018

‘THE PRESIDENT’S AWARD
ON THE OPEN GROUP
2017

OPEN GOVERNMENT AWARD
2017

MANAB KALLAN PADAK
2017

PUBLIC ADMINISTRATION AWARD
2016

ISIF AWARD
2014

রূপান্তরের দিগন্তে

ই-গভর্নেন্সের ফলে সরকারি সেবায় গতি এলেও ডিজিটাল বৈষম্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ডিজিটাল ডিভাইড মূলত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগের অভাব, যা অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত ও ভৌগোলিক কারণে হতে পারে। তবে, যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করেন না, তারাও পরোক্ষভাবে ই-গভর্নেন্সের সুফল ভোগ করেন, যেমন, লাইনে দাঁড়ানোর ভোগান্তি কমে যাওয়া। বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের প্রধান সমস্যা হলো ডিজিটাল সাক্ষরতার অভাব এবং সরকারি কর্মচারীদের মানসিকতা পরিবর্তন। ভবিষ্যতে ই-গভর্নেন্স আরও উন্নত হবে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে নাগরিকের চাহিদা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবা পাওয়া যাবে। ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হচ্ছে, যা সরকারি ও বেসরকারি সেবা সহজে পাওয়ার একটি আধুনিক ব্যবস্থা। তবে, এআই ব্যবহারের স্বচ্ছতা জরুরি। প্রযুক্তি নিয়ে মানুষের মনে শঙ্কা থাকলেও, বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়ে তা দূর করা যায়। ই-গভর্নেন্সের ভবিষ্যৎ ‘পোস্ট-ডিজিটাল’ যুগে নাগরিকরা আরও উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় সেবা পাবেন।

আগে কেবল ইউটিলিটি বিল দেওয়ার জন্যই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানো লাগতো। এখন অনলাইনে সরকারি সেবা চালু হওয়ায় অনেকেই ঘরে বসেই পেমেন্ট করেন। কাজেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার থেকে যারা পিছিয়ে আছেন তারাও সিরিয়াল বা বড় লাইনে দাঁড়ানোর বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাচ্ছেন। অর্থাৎ তারাও সুবিধা ভোগ করছেন।

দেশে দেশে 'ই-গভর্নেন্সের যাত্রা শুরুর পরে সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতি আসার বিপরীতে ডিজিটাল ডিভাইড বা প্রযুক্তিগত বৈষম্য তৈরি হচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে বলে জোরালো ভিন্নমত রয়েছে। বৈশ্বিক এই সংকট এবং শঙ্কাকে অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। আগেই জেনেছি ডিজিটাল ডিভাইড বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ এবং এর সুফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বা ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে যে বৈষম্য বা ব্যবধান বিদ্যমান, তাকে বোঝায়। এই ব্যবধান কয়েকটি কারণে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, ইন্টারনেট সেবার প্রাপ্যতা ও ডিভাইস না থাকা, ডিভাইস এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য সক্ষমতার অভাব এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুযোগের অভাব।

অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামোগত সংকট এবং ভৌগোলিক অবস্থানের (অর্থাৎ শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসের কারণে) ডিজিটাল ডিভাইড দেখা দিতে পারে। তবে ই-গভর্নেন্স-এর সুবিধা যারা নিতে পারছেন না, তারাও পরোক্ষভাবে এর সুফল পান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনও একটি সরকারি সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে আগে যে লম্বা লাইন হতো এখন আর সেই সংকটের মুখোমুখি হতে হয় না। আগে কেবল ইউটিলিটি বিল দেওয়ার জন্যই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানো লাগতো। এখন অনলাইনে সরকারি সেবা চালু হওয়ায় অনেকেই ঘরে বসেই পেমেন্ট করেন। কাজেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার থেকে যারা পিছিয়ে আছেন তারাও সিরিয়াল বা বড় লাইনে দাঁড়ানোর বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাচ্ছেন। অর্থাৎ তারাও সুবিধা ভোগ করছেন।

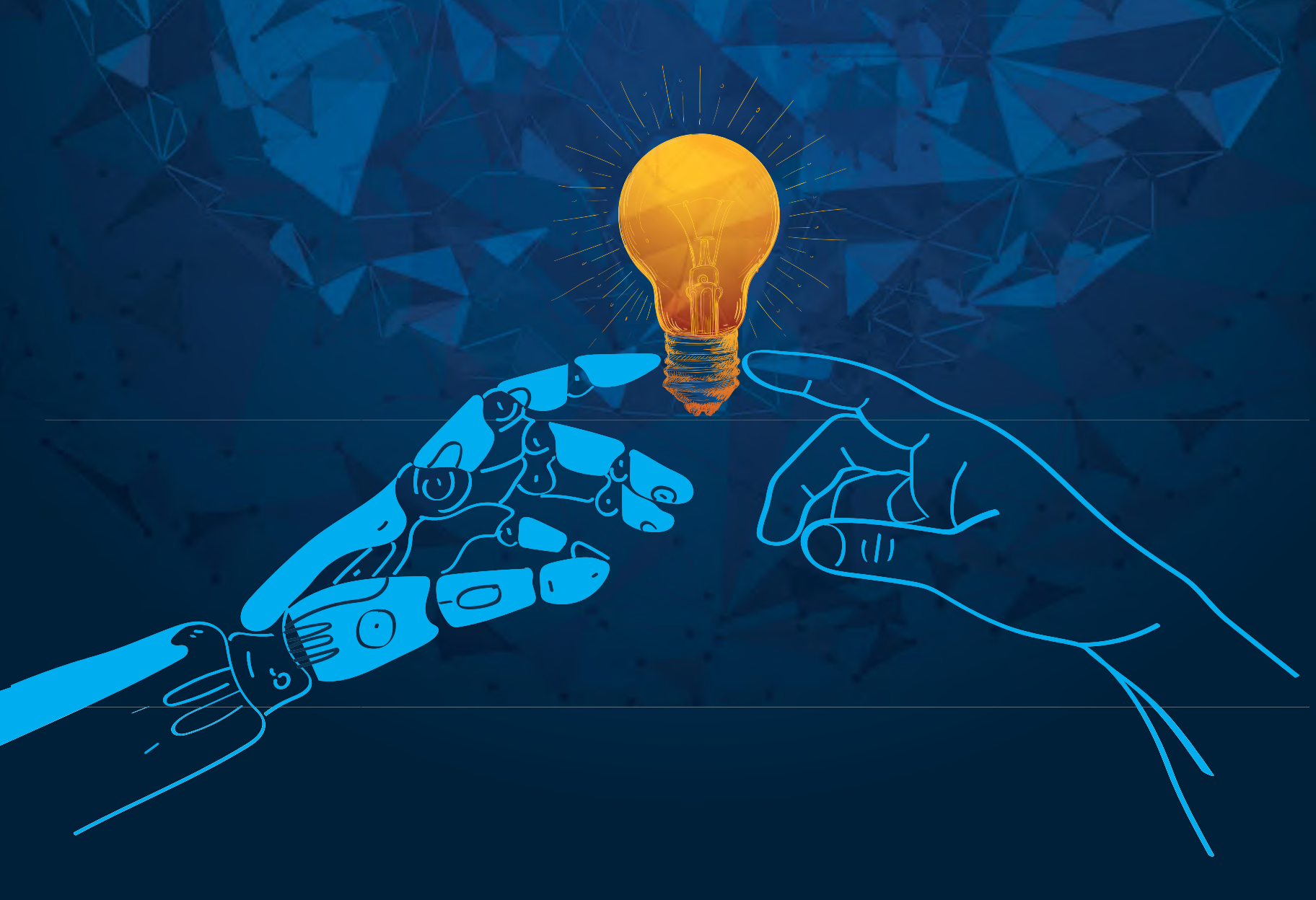

বাংলাদেশ: ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে সংকট কোথায়?

যেকোনও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার সমাজে প্রচলন করতে সময়ের প্রয়োজন হয়। বৈষম্যহীনভাবে সরকারি সেবা সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার পাশাপাশি সেবা প্রদানকারীর মনস্তত্ত্ব তৈরি করাও জরুরি।

> বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমনকি পাল্লা-বাটখারার জায়গায় ডিজিটাল ওজন মেশিন পর্যন্ত অনেক জায়গায় এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে পুরোপুরি প্রচলন করা যায়নি। ফলে সরকারি সেবায় প্রযুক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ততা গড়ে তোলাই ছিল চ্যালেঞ্জিং।

অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে ডিজিটাল সাক্ষরতা তৈরি করা এবং উদ্ভাবনের সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে নীতিমালা তৈরি এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে উদ্ভাবনের সংস্কৃতি গড়ে তুলে নাগরিকবান্ধব সেবা প্রদানের মনস্তত্ত্ব নির্মাণে আরও বহুপথ পাড়ি দিতে হবে।

> নাগরিকের চাহিদার দিকে মনোযোগ দিয়ে ই-গভর্নেন্স উদ্যোগগুলো নেওয়া উচিত এবং তাদের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

সূত্র

ওইসিডি, (২০০৭)। *ই-গভর্নমেন্ট স্টাডিজ: ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যাট এ গ্ল্যান্স ২০০৭*। লন্ডন: ওইসিডি পাবলিশিং।

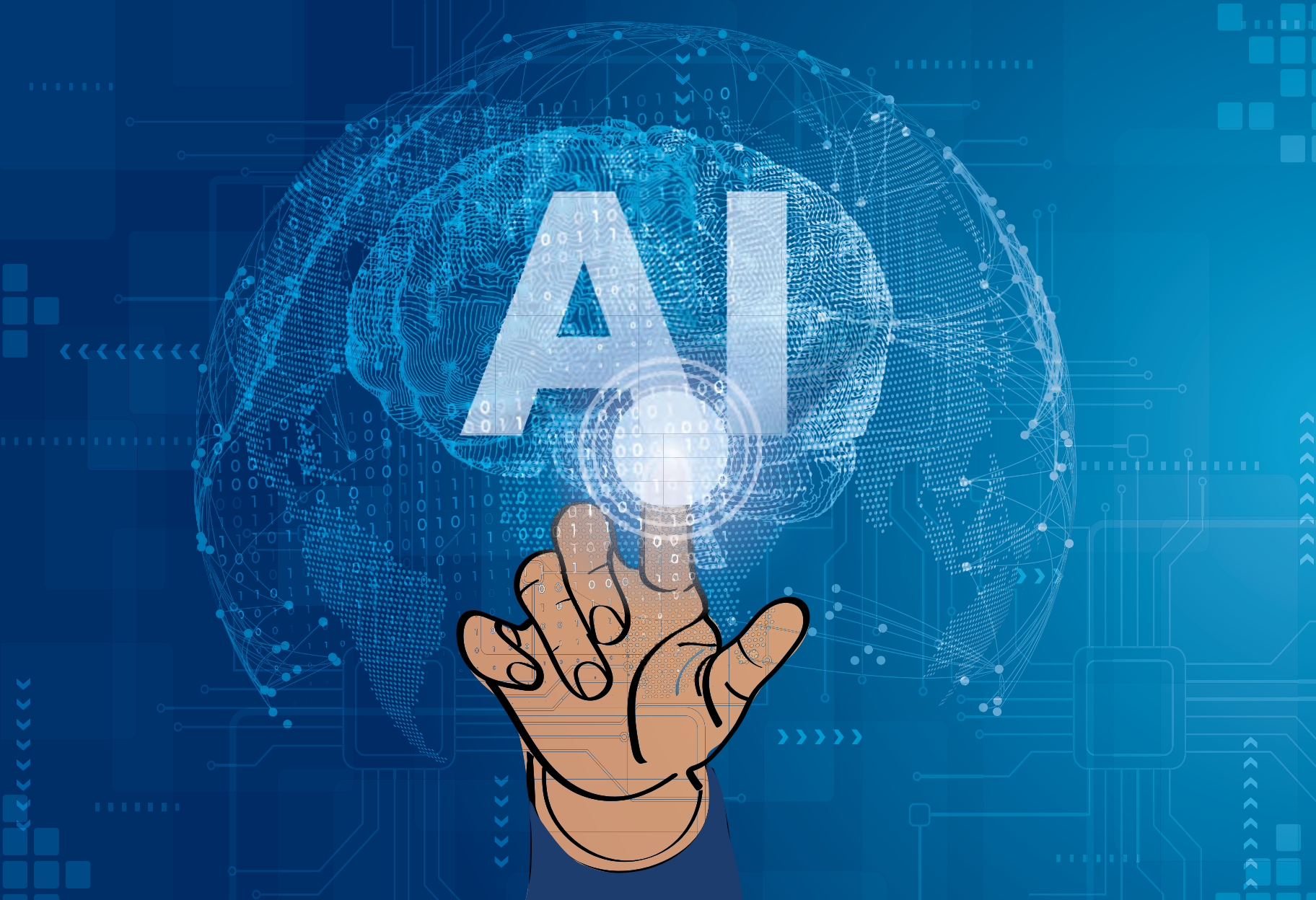
AI

ই-গভর্নেন্স ও ভবিষ্যত

সরকারের সেবাগুলো আমরা কীভাবে চাই, তা অনেকাংশেই বর্তমানে নির্ভর করে বেসরকারি খাতের সেবা থেকে আমরা কোন ধরনের তথ্যপ্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করছি সেটার ওপর। যেমন, ই-মেইল সেবা বলতে আমাদের হয়তো গুগলের জি-মেইল বা ইয়াহু মেইলকে মানদণ্ড বা রেফারেন্স হিসেবে ধরি। আমাদের দেশে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রচুর, নিউজ পোর্টালের পাঠকের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। কাজেই সরকারি সেবা গ্রহণের সময় নাগরিকদের রেফারেন্স হিসেবে এসব দৃষ্টান্তের কথাই মনে পড়বে। ফেইসবুকে যেমন একটি পাসওয়ার্ড বা আঙুলের ছাপ দিয়েই ঢোকা যায়, গুগলের এক পাসওয়ার্ড দিয়ে যেমন ইমেইল, ড্রাইভ, ইউটিউব এবং অন্যান্য সবকিছু খোলা যায়, সরকারি সেবা নিতে গিয়ে কেন এতোকিছু করতে হবে? ফেইসবুক বা গুগল অ্যাকাউন্টের সকল সেবায় এক পাসওয়ার্ড দিয়ে কেন ঢুকতে পারবো না? আবার এইসব খ্যাতনামা কোম্পানিগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অ্যালগরিদম ব্যবহার করে পছন্দের নানা কনটেন্ট আমাদের সামনে আনে। ই-গভর্নেন্সের মধ্য দিয়ে এমন সুবিধা পাওয়া যাবে কি?

> ই-গভর্নেন্সে এগিয়ে থাকা দেশগুলো ইতিমধ্যে একটি ইউনিক আইডির মাধ্যমে সকল ধরনের সরকারি সেবা হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ সরকারও আগামীতে এদিকেই এগোচ্ছে। তবে এখানেই থেমে থাকা নয়।

গার্টনারের মডেল অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় ধাপে আছে— মিথস্ক্রিয়া পর্যায়ে। অর্থাৎ, সরকার অনলাইনে বিভিন্ন ফরম, ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ এবং মতামত দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে।

প্রযুক্তি বিশ্লেষক গিডিয়ন গার্টনার একটি মডেল তৈরি করেছেন, যেখানে ই-গভর্নেন্স বা ডিজিটাল সরকার গঠনের পথকে চারটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ধাপ হলো 'তথ্য'। এই ধাপে সরকার অনলাইনে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে। যেমন: ওয়েবসাইটে নীতিমালা, দরকারি ফরম ও যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করা হয়। এতে করে জনগণ সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারে এবং সরকারের কাজ আরও স্বচ্ছ হয়।

দ্বিতীয় ধাপ হলো 'মিথস্ক্রিয়া'। এখানে নাগরিক ও সরকারের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগের সূচনা হয়। যেমন: ফরম ডাউনলোড করা, ই-মেইলে উত্তর পাওয়া অথবা ওয়েবসাইটে প্রশ্নোত্তর দেখা যায়।

তৃতীয় ধাপে আসে 'লেনদেন'। এই সময় নাগরিকরা সরাসরি অনলাইনে বিভিন্ন সরকারি সেবা নিতে পারে– যেমন কর দেওয়া, লাইসেন্স নবায়ন করা ইত্যাদি। এতে সময় বাঁচে এবং সেবা পাওয়া আরও সহজ হয়।

শেষ ধাপ হলো 'রূপান্তর'। এই ধাপে সরকারের কাজের ধরন পুরো বদলে যায়। বিভিন্ন বিভাগের সেবা একসাথে যুক্ত হয়, নাগরিকদের প্রয়োজন বুঝে ডিজাইন করা হয় সেবাগুলো এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তথ্য বা ডেটা ব্যবহার করা হয়। ফলে সরকার আরও স্মার্ট, সক্রিয় ও জনবান্ধব হয়ে ওঠে।

এই চারটি ধাপ দেখায়, কীভাবে কেবল তথ্য দেওয়ার মাধ্যম থেকে শুরু করে পুরোপুরি ডিজিটাল সেবা চালুর দিকে সরকার অগ্রসর হয়। এটি একটি জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও সক্রিয় এমন ডিজিটাল গভর্নেন্সের প্রতিশ্রুতি বহন করে।

গার্টনারের এই মডেল অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় ধাপে আছে– মিথস্ক্রিয়া পর্যায়ে। অর্থাৎ, সরকার অনলাইনে বিভিন্ন ফরম, ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ এবং মতামত দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এখনো কর পরিশোধ বা সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মতো পূর্ণ অনলাইন সেবা পুরোপুরি চালু হয়নি।

চিত্র ৬.১: গার্টনারের ই-গভর্মেন্ট পরিপক্কতা মডেল

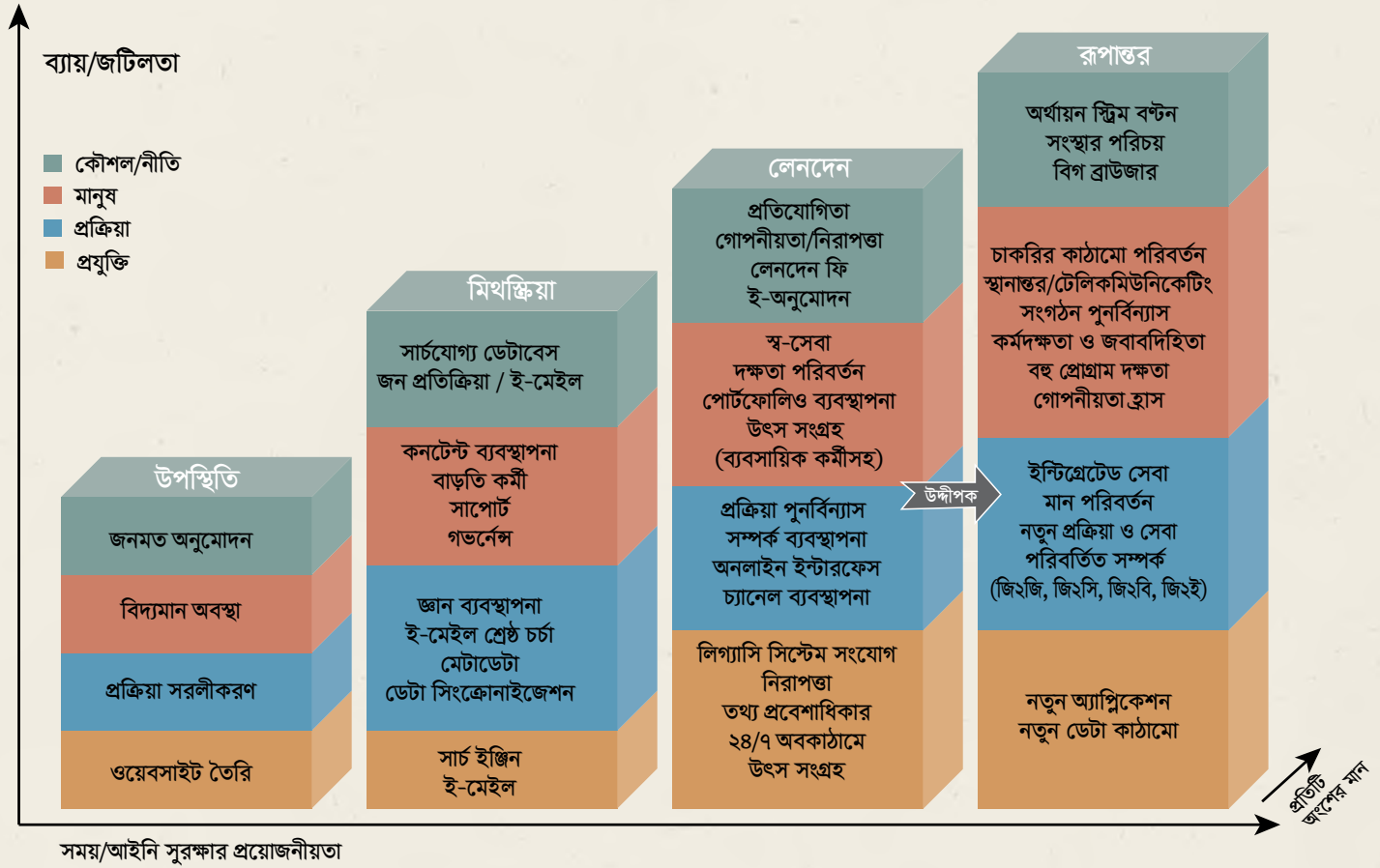

সূত্র: কোর্সে, ডি., ও নরিস, ডি. এফ. (২০০৮)। মডেলস অব ই-গভর্নমেন্ট: আর দে কারেক্ট? এন এমপিরিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। *পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিভিউ*, ৬৮(৩), ৫২৩-৫৩৬।

ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই)

পোস্ট ডিজিটাল প্রজন্মের সঙ্গে ডিপিআই-এর ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডিপিআই হলো বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনকারী একটি একক সিস্টেম। এটি ওপেন স্ট্যান্ডার্ড ভিত্তিক অর্থাৎ এই ব্যবস্থাটি এমন কিছু নিয়ম ও মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা সবাই ব্যবহার করতে পারবেন এবং যেটি পরিচালনার সঙ্গে সবার কম-বেশি জানাশোনা রয়েছে।

> ডিপিআই একটা সুরক্ষিত ও আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা সহজে পাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে সকল নাগরিক সমান সুযোগ পান এবং একে অপরের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হতে পারে।

পরিচয় শনাক্তকরণ, অর্থ প্রদান এবং ডাটা বিনিময়ের মতো ডিপিআই-এর মৌলিক উপাদানগুলো সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা সরবরাহ এবং উদ্ভাবনকেও ত্বরান্বিত করে। যখন উন্নয়নশীল দেশগুলোয় এই সিস্টেম বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তিগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

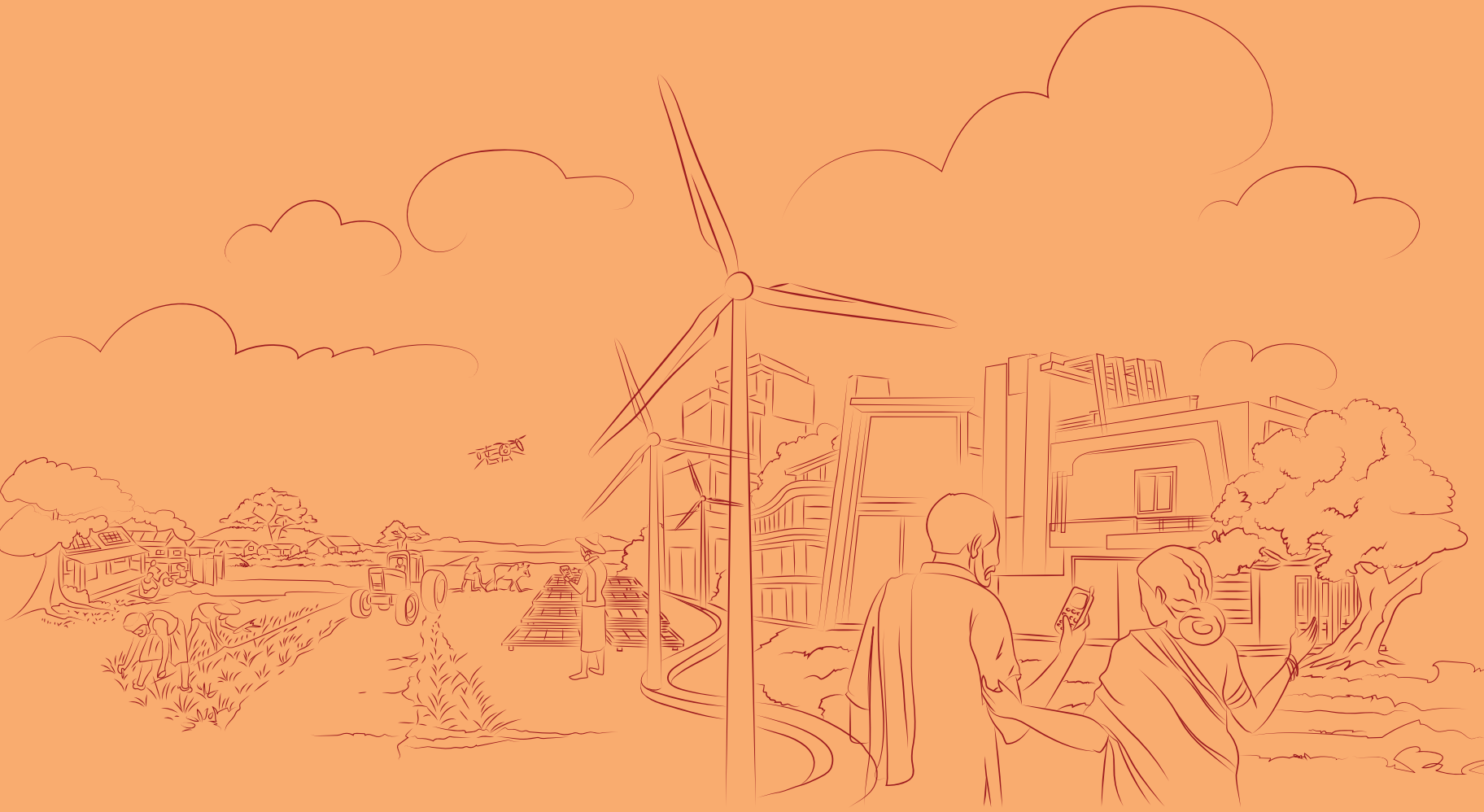

২০৩০ সালের মধ্যে ডিপিআই-তে পুরোদস্তুর এআই যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ওই সময়ের মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে এআই ট্রিলিয়ন ডলারের অবদান রাখার পাশাপাশি জেনারেটিভ এআই ব্যবহার করে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত হবে বলে বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে।

হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ-এর একটি গবেষণা প্রতিবেদনের মতে, ডিজিটাল আইডি (ডিপিআই-এর একটি মৌলিক উপাদান) একাই মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩-১৩% সমপরিমাণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে গড়ে ৬% উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে উদীয়মান অর্থনীতির ক্ষেত্রে। এই প্রভাব নাগরিক ও সরকার উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, প্রযুক্তিগত বিভাজন হ্রাস করে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যাবশ্যক সেবা ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে, যা সামগ্রিকভাবে সামাজিক বৈষম্য কমাতে সহায়তা করে।

২০৩০ সালের মধ্যে ডিপিআই-তে পুরোদস্তুর এআই যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ওই সময়ের মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে এআই ট্রিলিয়ন ডলারের অবদান রাখার পাশাপাশি জেনারেটিভ এআই ব্যবহার করে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত হবে বলে বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, বিশ্বজুড়ে সরকার, কর্পোরেশন ও সংস্থাগুলো এআই কৌশল নির্ধারণের প্রচেষ্টায় মনোযোগী হয়েছে।

তবে, এআই কীভাবে কাজ করে, তা প্রায়ই গোপন থাকে। এর পেছনের নিয়মকানুনগুলো কারা তৈরি করছেন এবং কীভাবেই বা চালান, তা সাধারণত এই সেবা প্রদানকারী কোম্পানিগুলো প্রকাশ করে না। এই কারণে অস্বচ্ছতা তৈরির শঙ্কা থেকে যায়। এই গোপনীয়তা এবং অস্পষ্টতার কারণে তথ্যের নিরাপত্তা এবং জ্ঞানের আদান-প্রদান একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

চিত্র ৬.২: ডিপিআই-এর প্রভাব বিশ্লেষণ কাঠামো

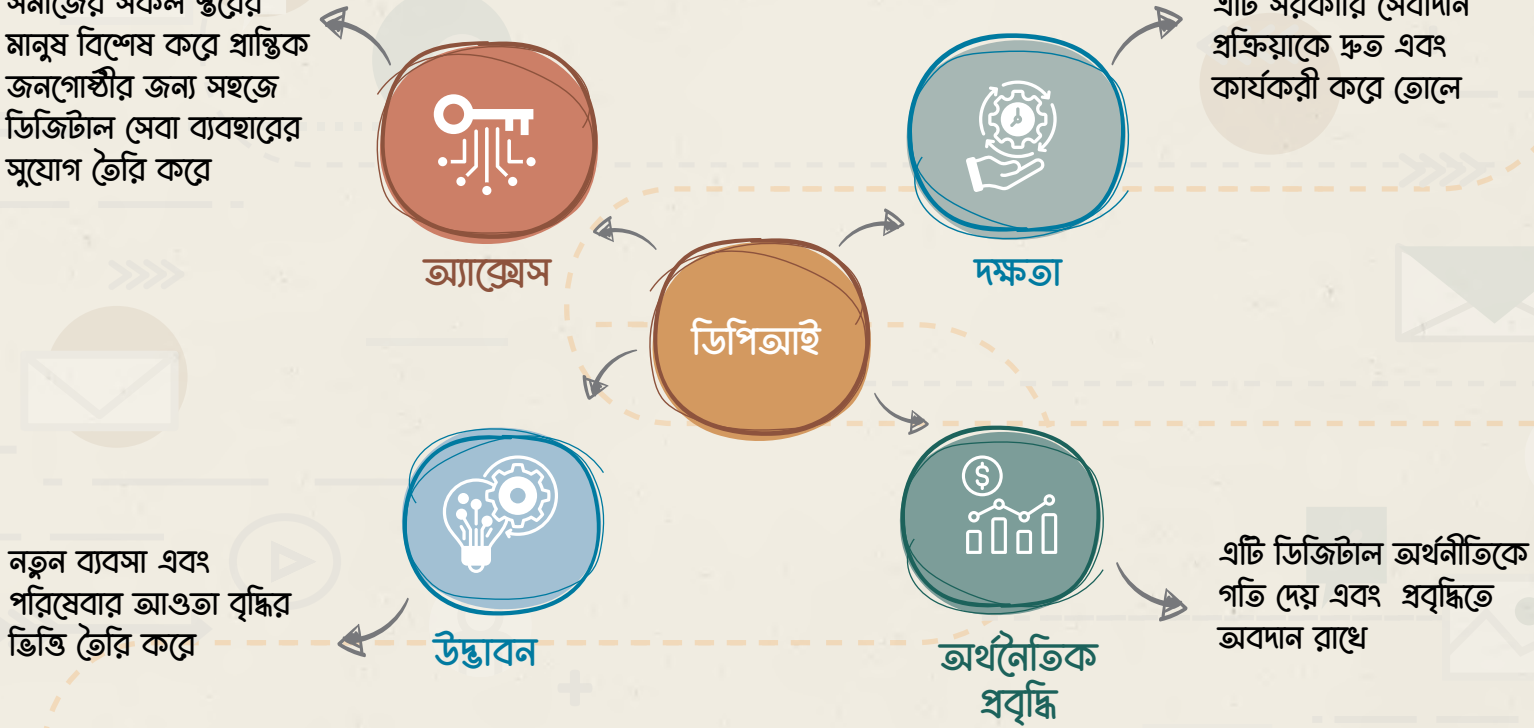

সূত্র: এই বইয়ের পাঠ্য থেকে তৈরি

চিত্র ৬.৩: পার্সোনাল গভর্নমেন্ট ইকোসিস্টেম

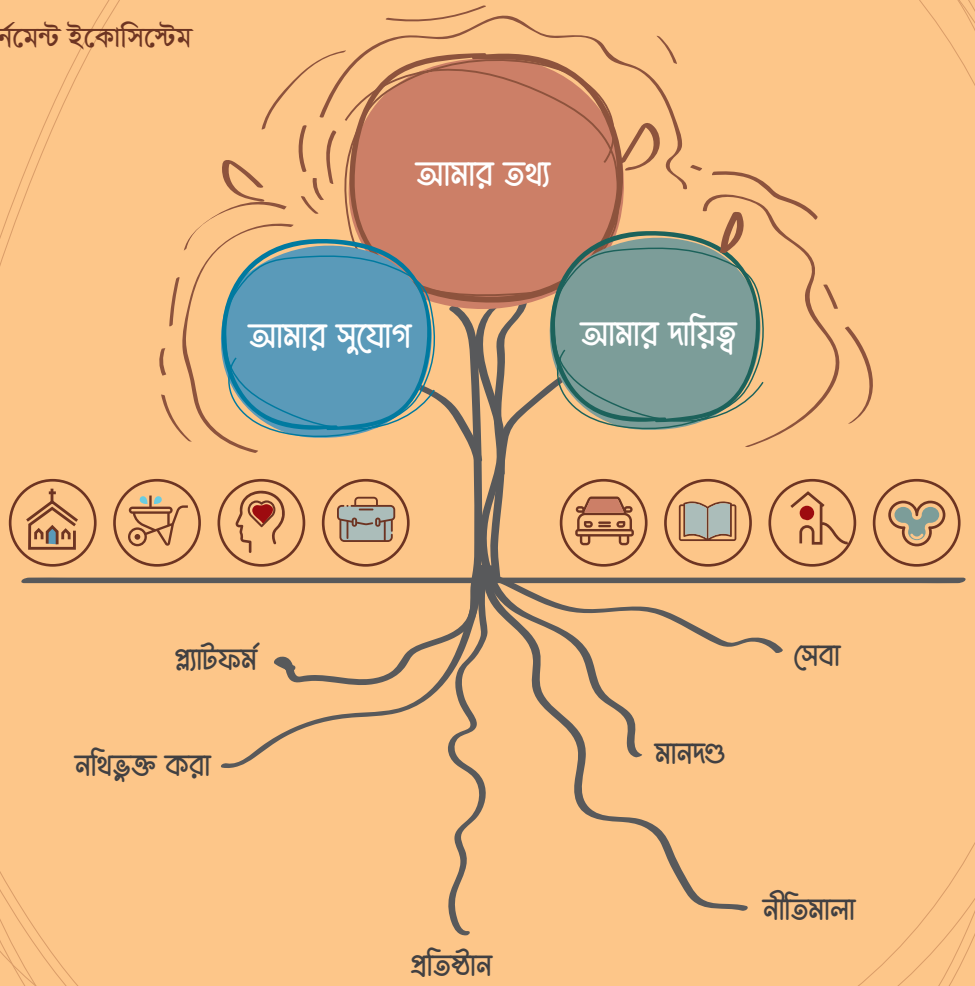

সূত্র: দ্য পার্সোনাল গভর্নমেন্ট ডট কম। (এন.ডি.)। *দ্য পার্সোনাল গভর্নমেন্ট ইকোসিস্টেম*। (অনুপ্রাণিত)

যখন রাইডশেয়ারিং এসেছিল তখন অনেকেই ট্যাক্সি সেবার সঙ্গে মিলিয়ে বলেছেন, এটি তো রয়েছেই, ট্যাক্সিই ঠিক মতো চলেনি, আবার এটা চলবে! মাত্র অর্ধযুগে রাইড শেয়ারিং বাংলাদেশের জনপদে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটি নাগরিক সুবিধায় পরিণত হয়েছে।

যখন অনলাইন ব্যাংকি চালু হয় তখন অনেকেরই মত ছিল 'ডিজিটাল মানি' পাগল ছাড়া কেউ ব্যবহার করবে না। ব্যাংকগুলো টাকা হাওয়া করে দিবে- এমন সন্দেহও কেউ কেউ প্রকাশ করেছিল।

মোদ্দা কথা হলো, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে উদ্ভাবন সবসময়ই নাগরিকের মনে অনভ্যস্ততাজনিত শঙ্কা তৈরি করেছে। তবে এটিকে জয় করা যায় বিশ্বস্ততা দিয়েই।

> ই-গভর্নেন্সের 'পার্সোনাল গভর্নমেন্ট' কনসেপ্ট এবং পোস্ট-ডিজিটাল যুগ এতটাই নতুন যে এটির দৃশ্যকল্প শুনলে মনে হবে সায়েন্স ফিকশনের গল্প বলা হচ্ছে। কিন্তু বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস ও কৃত্রিম প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আগামী পাঁচ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার সেদিকেই যাচ্ছে। বাংলাদেশও পিছিয়ে থাকবে না। ইতিমধ্যে কাজ শুরুও হয়েছে।

গল্প হলেও সত্যি

১০-১২টি কটেজ নিয়ে গড়ে উঠেছে রিসোর্টটি। অদূরে নদীর মোহনায় সাগর। ফার্মহাউজ হলেও চাষাবাদের পাশাপাশি খেলা, সাঁতার কাটা এবং বিনোদনের নানা আয়োজন রয়েছে এখানে।

রিনা আর সুমনের প্ল্যান ছিল বিয়ের পর দুই পরিবারের সবাই মিলে কোথাও কিছুদিন একসাথে থাকবে। অনলাইনে সবার রিসোর্টে আসার যানবাহনের টিকেটও রিনা বুকিং দিয়ে রেখেছিল আগে থেকে। কেউ সকালে, কেউ দুপুরের পর, আবার কেউ বা সন্ধ্যায় রিসোর্টে আসার পর অটো চেক ইন হয়েছে।

সুমনের মা-কে নিয়ে সবার প্রথমে পৌঁছায় রিনা-সুমন। রিনার মা-বাবাকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে আসেন তার সরকারি চাকরিজীবী বড় বোন বীণা ও ব্যাংকার দুলাভাই।

সুমনের একমাত্র বোন ও বোন-জামাই তাদের ১০ বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে বিমানবন্দর থেকে নেমে সরাসরি রিসোর্টে এসেছে। সবার পরে এসেছে রিনার ছোট ভাই, পার্বত্য অঞ্চল থেকে। সেখানে তিনি একটি কোম্পানির বিক্রয় ম্যানেজার।

স্বজনদের নিয়ে রিসোর্টের দিনগুলোকে স্মরণীয় রাখতে প্রতিদিনই কোনও না কোনও বিশেষ আয়োজন রাখা রয়েছে। অনলাইনে আগেই বিস্তারিত শিডিউল করে দেওয়া হয়েছে।

প্রথমদিন সবাই যার যার কটেজে ঢুকে বিশ্রাম নিয়ে ফ্রেশ হতে হতে সন্ধ্যা ৭টা বেজে যায়। রিসোর্টের বাইরের খোলা জায়গায় সেদিন আয়োজন করা হয় বারবিকিউ-এর। সেখানে গিটার নিয়ে সামান্য গান-বাজনার আয়োজনও ছিল। তবে অনুষ্ঠানের মধ্যেই রিনাকে একটি অনলাইন মিটিং সারতে উঠে যেতে হয়েছিল। বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং-এর কাজ করেন রিনা। অনলাইনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রেতাদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন প্রোগ্রামারদের কাছ

থেকে সফটওয়্যার তৈরি করিয়ে পাঠানোর কাজ তার। এবার একটি দেশের সরকারের জন্য বিশেষ ধরনের ‘রেসপন্সিভ ট্যাক্স সফটওয়্যার’ বানানোর চাহিদা এসেছে। এর পাশাপাশি বাকি থাকা পুরনো পেমেন্টও দিয়েছেন ক্রেতারা। সেই পেমেন্ট আবার মিটিং চলাকালেই সফটওয়্যার প্রোগ্রামারদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছেন রিনা।

রিনার দুলাভাই ব্যাংকের ক্লায়েন্ট ও সহযোগীদের সঙ্গে অনলাইনেই হিসাব-নিকাশ সেরেছেন।

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে কাজের জন্য এখনও অন্য রুমে এতক্ষণ মিটিং করার জন্য রিনার দুলাভাই টিটকারি কাটে তাকে। সুমন কৃষি নিয়ে কাজ করে। দুলাভাইয়ের কথায় সায় সে জানায়, রিসোর্টের পথে আসতে আসতেই ধানগাছের নতুন ভাইরাস ফোনেই ছবি দেখে শনাক্ত করে কীটতত্ত্ববিদের পরামর্শ নিয়ে ছোট ছোট কৃষি খামারে ভ্যাকসিন পৌঁছে দিয়েছে। পেমেন্টও পেয়ে গেছে।

রিনা কপট রাগ দেখিয়ে উত্তর দেয়, আমরা এরকম এক্সক্লুসিভ সময় দিয়ে সফটওয়্যার এভাবে তৈরি করি বলেই তোমাদের এত সুখ!

তর্কাতর্কি থামায় রিনার বাবা। জানায়, আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিল গেট-টুগেদারের প্রথম রাতটি স্মরণীয় করে রাখতে নতুন দম্পতিকে সে কিছু পরিমাণ জমি উপহার দেবে। যেটি সে ইন্টারনেট ব্যবহার করে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই রিনা ও সমুনের নামে নামজারির ব্যবস্থা করল।

পরের কয়েকদিন অদূরে সাগর এবং আশেপাশের দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখার পরিকল্পনা ছিল। রিনার বড় বোন বীণা তার সরকারি ফাইলপত্রের কাজ সাগর পাড়ে হাঁটতে হাঁটতেই সারলো।

সুমনের বোন এবং তার বর এসেছে ইউরোপের একটি দেশ থেকে। সুমনের বোন কাজ করে ইউনিভার্সিটিতে। ঘোরাফেরার ফাঁকেই সুমনের বোন বেশকিছু অন্যদেশে থাকা ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর অনলাইনেই পরীক্ষা নিলো। পাশাপাশি নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে একটি রিসার্চ পেপারের কাজও কিছুটা এগিয়ে নিলো।

সুমনের বোন জামাই বিদেশে বসেই একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, যেটি ইউরোপের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কাছে পরিবেশ-বান্ধব ব্যাগ সরবরাহ করে। অনলাইনে বসেই সে ব্যাগের মান চেক করে ফিডব্যাক দিচ্ছিল।

শীতকাল হলেও পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। আর সেই কারণে ওয়েদার অ্যাপ অনুযায়ী, রিনার ভাই মিন্টু নিজের সেলসফোর্সকে বিভিন্ন জায়গায় শিডিউল পরিবর্তন করে ডেপ্লয় করেছিল আড্ডা ও ঘোরাফেরার ফাঁকেই। এমনকি সুমনের দশ বছর বয়সী ভাগ্নেও সুদূর জার্মানিতে থাকা শিক্ষকের কাছ থেকে বেহালার ক্লাস করলো রিসোর্টে বসেই।

সুমনের বিধবা মা একটি উন্নয়ন সংস্থা থেকে অবসর নিয়েছে। অবকাশ যাপনের শেষ দিন বিকালে সাগরের পাশে বসে সবাই যখন নাস্তা সারছে, তখন সে হঠাৎই উঠে গিয়ে রিনার পেছনে দাঁড়ায়। একটি বাদক দল কোথা থেকে হাজির হয়। নকশাখচিত বাক্স থেকে একটি সোনার হার বের করে সুমনের মা রিনাকে পরিয়ে দেয়।

সবার প্রশ্ন ছিল, কীভাবে মা এটি সম্ভব করলো! মা জানায়, ওখানে যাওয়ার পর অনলাইনেই অর্ডার করেছে। নিজের জমানো টাকার অ্যাকাউন্টে একটা 'ইয়েস বাটন' ক্লিক করা মাত্রই রিসোর্টেই গয়না পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে একটি ছোট্ট দুর্ঘটনাও ঘটে। সাগরে ঘুরতে গিয়ে ধারাল প্রবালে রিনার মায়ের পা কেটে যায়। রিসোর্টে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে স্থানীয় হাসপাতালে যোগাযোগ করে চিকিৎসক দেখানো হয়। চিকিৎসক রিনার মায়ের হেলথ কার্ড নম্বর এন্ট্রি দিয়ে আগের চিকিৎসার অনলাইন রেকর্ডস দেখে তাকে প্রেসক্রিপশন দেয়। এর ১০ মিনিটের মধ্যে ভলান্টিয়ার এসে ওষুধ এবং ব্যান্ডেজ করে দিয়ে যায়। চিকিৎসা ফি রিনার মায়ের ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে রাখা হয়।

এভাবেই কিছু সুখকর বিরল মুহূর্ত স্মৃতিতে নিয়ে শেষ হয় রিনা-সুমনের বিয়ে পরবর্তী গেট-টুগেদার অনুষ্ঠানের দিনগুলো। এই পরিবারগুলোর সাথে যুক্ত বাকি স্বজনেরাও সেই সুখস্মৃতি শেয়ার করে নিতে পারে যখন গেট-টুগেদারের ছবি ও ভিডিওগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়।

গল্পটি বর্তমানে কাল্পনিক মনে হলেও, দশ বছর পরেই এটি বাস্তব। গল্পে খালি চোখে যা দেখছি তা হলো

রিনা বিদেশিদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারছে। নিজের পেমেন্ট ও উদ্যোক্তাদের মুহূর্তেই পেমেন্ট করতে পারছে।

সুমন অনলাইনেই ফসলের ভাইরাস শনাক্ত করে নিজের ফার্মের সেবা ছোট ছোট কৃষি ফার্মে পৌঁছে দিতে পারছে।

বাংলাদেশ থেকেই অফিস করতে পারছেন সুমনের প্রবাসী দুলাভাই। এমনকি রিনার বোন-জামাইও তার কাজ করতে পারছে।

সুমনের বোন রিসোর্টে বসেই তার বিদেশি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিতে পারছে। সুমনের ভাগ্নেও বেহালার ক্লাস করতে পারছে।

সুমনের মা গয়না অর্ডার করতে পারছে এবং রিনার বাবা সম্পত্তি উপহার দিতে পারছে। সম্পত্তি নামজারির কনফার্মেশন এবং সম্মতি মেসেজ আসছে কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

রিনার মাকে ই-হেলথ কার্ড দেখে সহজেই চিকিৎসক চিকিৎসা দিতে পারছে।

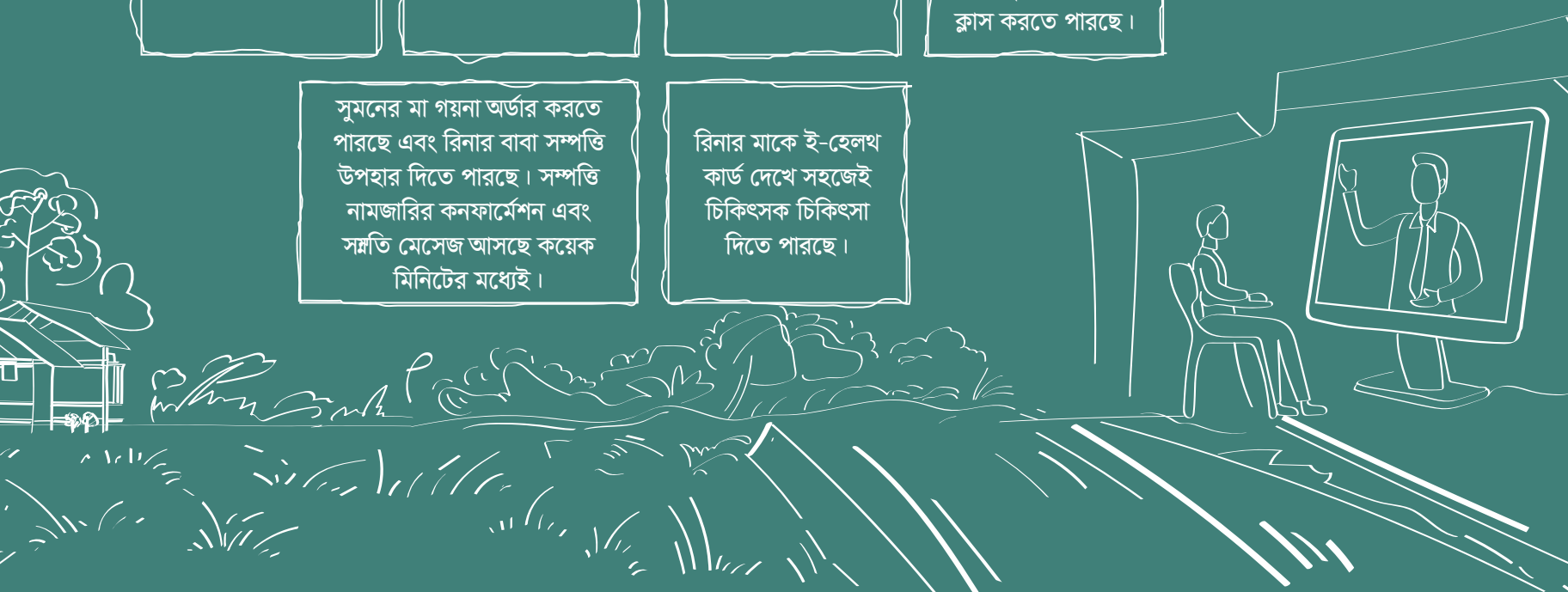

এই গল্পটিতে যা অদৃশ্যমান–

দেশব্যাপী একটি শক্তিশালী ই-গভর্নেন্স ইকোসিস্টেম তৈরি হয়েছে। সব জায়গা থেকেই মানুষ অনলাইনে বিভিন্ন সেবা নিতে পারছেন বা সরকারি সেবা ব্যবহার করে নিজেদের কাজ করতে পারছে।

পেমেন্ট গেটওয়ে তৈরি করে খুব সহজেই লেনদেনগুলো দ্রুততার সঙ্গে করতে পারছে।

কৃষিসেবা সহজতর হয়েছে। ফসলের মাঠ থেকে দূরে বসেই সহজেই রোগ শনাক্ত করে অনলাইনেই পৌঁছানোর ভ্যাক্সিন দেওয়া যাচ্ছে। এর জন্য কৃষি সংক্রান্ত সব দপ্তরের অনলাইন সেবাকে একীভূত করতে হয়েছে।

অনলাইনে নিবন্ধিত নাগরিকদের সহজেই চিকিৎসা সেবা দেওয়া যাচ্ছে। এর জন্য দেশের সব সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের সেবাকে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় আনতে হয়েছে।

ডাটাবেজ ডেভেলপ করতে হয়েছে। এমনকি বিমা কোম্পানি কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি প্রযুক্তিভিত্তিক যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়েছে।

একজন নাগরিক তার হাতের ডিভাইস থেকেই সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর, নামজারি, ই পর্চা ইত্যাদি খুব সহজেই করতে পারছে। অনেক জায়গার পরিবর্তে একটি প্ল্যাটফর্মেই একজন নাগরিক কম সময়ের মধ্যে এটি করতে পারছে। আবার নোটিফিকেশন চলে যাচ্ছে উত্তরাধিকারদের কাছেও।

আবহাওয়ার নিখুঁত তথ্য পেতে বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারের অবকাঠামো ও ইকোসিস্টেম তৈরি করতে হয়েছে। নাগরিকেরা যাতে সেই তথ্য অনলাইনে বসেই কাজে লাগাতে পারেন সেই ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে।

ঘরে বসেই টিকেট কাটা ও পরিবহন সংক্রান্ত নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতে যোগাযোগ খাতের সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব পরিবহনের সময়সূচি, সড়কে যানজটের অবস্থা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সিস্টেমকে একীভূত করার মধ্য দিয়ে এই ইকোসিস্টেম তৈরি হয়েছে।

শেষ কথা

ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আজ যা সায়েন্স ফিকশন মনে হচ্ছে, সেটিই আসলে আগামী দিনের বাস্তব হয়ে উঠতে যাচ্ছে। আর এই রূপান্তর বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশ সরকার আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে প্রত্যাশা করা যায়।

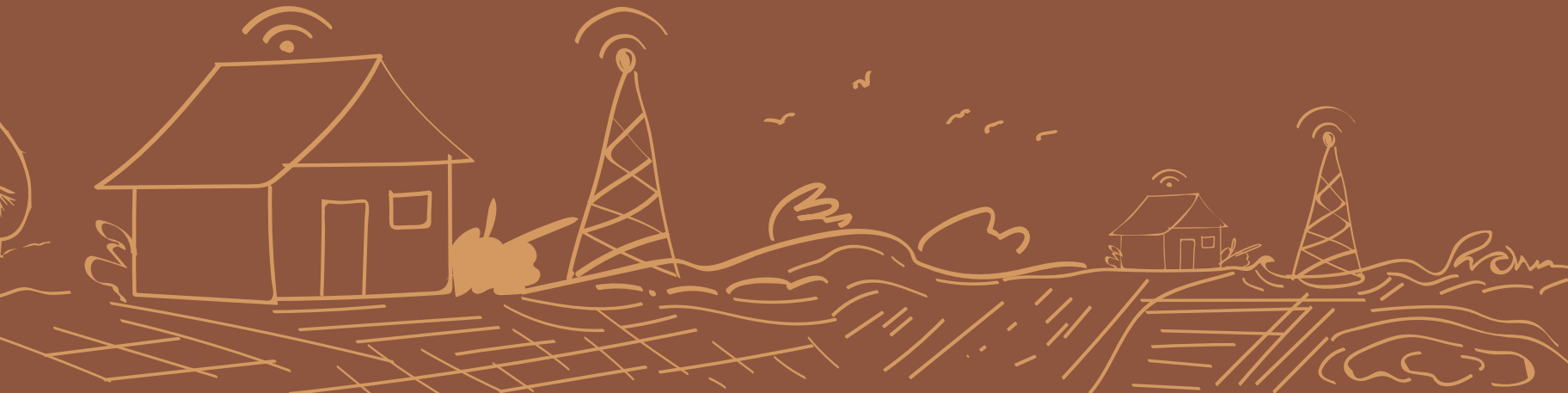

রূপান্তরের ভাষা হচ্ছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তির এই মহাসড়কে বাংলাদেশ অনেকটা পথ এগিয়েছে। এই পথ পরিক্রমায় যেমন চড়াই উৎরাই ছিল, তেমনি ছিল জনকল্যাণে প্রযুক্তি ব্যবহারের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের আনন্দ। এই যাত্রাপথে সহযোগী হয়ে পাশে ছিল এটুআই।

কিন্তু আমাদের যেতে হবে বহুদূর। তাই এখন শুধুই এগিয়ে চলা। প্রযুক্তির কল্যাণে দূর হবে সকল বৈষম্য। সরকারের দূরদৃষ্টি, জনকল্যাণমুখী নীতি আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইনসহ অগ্রসরমান প্রযুক্তির কল্যাণে আগামীর বাংলাদেশ হবে উদ্ভাবনী বাংলাদেশ। এই কল্যাণ যাত্রায় পাশে আছে এটুআই।

সংক্ষিপ্ত রূপ

১. এটুআই – এসপায়ার টু ইনোভেট

২. এআই – কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

৩. বিবিএস – বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৪. বিডিটি – বাংলাদেশি টাকা

৫. বিআরটিসি – বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

৬. সিএমএসএমই – কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ

৭. ডিসি – জেলা প্রশাসক

৮. ডি-নথি – ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

৯. ইজিডিআই – ই-সরকার উন্নয়ন সূচক

১০. ইএলআরএস – ইলেকট্রনিক ভূমি রেকর্ড সেবা

১১. ইএমটিএপি – অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

১২. জিটুসি – সরকার থেকে নাগরিকের কাছে সেবা

১৩. জিটুবি – সরকার থেকে ব্যবসায় সেবা

১৪. জিটুই – সরকার থেকে কর্মচারীদের কাছে সেবা

১৫. জিটুজি – সরকার থেকে সরকারের মধ্যে সেবা

১৬. জিইডি – সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

১৭. জিটিএমআই – গভ-টেক পরিপলক্কতা সূচক

১৮. আইসিটি – তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

১৯. আইআরএম – ইনস্টিটিউট অব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট

২০. আইটি – তথ্য প্রযুক্তি

২১. এমএফএস– মোবাইল আর্থিক সেবা

২২. এনএসপিডি – প্রতিবন্ধীদের জাতীয় জরিপ

২৩. এনপিএম – নতুন জনপরিচালনা

২৪. ওইসিডি – অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা

২৫. পিআইড – প্রোগ্রাম প্রারম্ভিক নথি

২৬. পিএমও – প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২৭. পিএসটিএন – পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্ক

২৮. এসডিজি – টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য

২৯. এসআইসটি – তথ্যপ্রযুক্তি টাস্কফোর্স সহায়তা প্রকল্প

৩০. এসএসএনফোরপিএসআই – জনসেবা উদ্ভাবনের জন্য সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্ক

৩১. টিসিভি – সময়-ব্যয়-যাতায়াত

৩২. ইউডিসি – ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার

৩৩. ইউআইএসসি – ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র

৩৪. ইউএনডিপি – জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি

৩৫. ডব্লিউএসআইএস – তথ্য সমাজ বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন

তথ্যসূত্র

ভূমিকা

জাতিসংঘ, (২০০০)। *সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা*। জাতিসংঘ

ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডাব্লিউএসআইএস), (২০০৫)। *তিউনিস কমিটমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান*। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)।

উদ্ভবন সংস্কৃতি: ই-গভর্নেন্স

শাম্পেটার, জে.এ. (১৯৪২)। ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি। নিউ ইয়র্ক: হার্পার অ্যান্ড ব্রাদার্স।

অসবর্ন, ডি. এবং গ্যাবলার, টি. (১৯৯২)। *রিইনভেন্টিং গভর্নমেন্ট: হাউ দ্য এন্টারপ্রেনিউরিয়াল স্পিরিট ইজ ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর*। *রিডিং*। ম্যাসাচুসেটস: অ্যাডিসন-ওয়েসলি পাবলিশিং কোম্পানি।

হুড, সি. (১৯৯১)। এ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট ফর অল সিজনস? *পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন*, ৬৯(১), পৃ.৩-১৯। অক্সফোর্ড: উইলি-ব্ল্যাকওয়েল।

বিকাশের পর্যায়

ইউএনডিপি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০০৭-২০০৮)। *ই-গভর্নেন্স হরাইজন স্ক্যান রিপোর্ট*।

বিশ্ব ব্যাংক। (২০১০)। *ই-গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিস*। বিশ্ব ব্যাংক।

ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ), (২০২১)। *মেজারিং ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট: ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স ২০২১*। আইটিইউ।

সিটিজেন নেট: প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা

নেদারল্যান্ডস পুলিশ আর্কাইভস এবং এটুআই কেস স্টাডিজ, (১৯৯৩-২০১২)। সিটিজেন নেট কেস ডকুমেন্টেশন, নেদারল্যান্ডস।

সৃষ্টিশীল ধ্বংসযজ্ঞ

শাম্পেটার, জে.এ. (১৯৪২)। ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি। নিউ ইয়র্ক: হার্পার অ্যান্ড ব্রাদার্স।

হুড, সি. (১৯৯১)। এ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট ফর অল সিজনস? *পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন*, ৬৯(১), পৃ.৩-১৯। অক্সফোর্ড: উইলি-ব্ল্যাকওয়েল।

অসবর্ন, ডি. এবং গ্যাবলার, টি. (১৯৯২)। রিইনভেন্টিং গভর্নমেন্ট: হাউ দ্য এন্টারপ্রেনিউরিয়াল স্পিরিট ইজ ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর। *রিডিং*। ম্যাসাচুসেটস: অ্যাডিসন-ওয়েসলি পাবলিশিং কোম্পানি।

কাঠামোতে রূপান্তর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, (২০০২)। *বাংলাদেশ আইসিটি পলিসি*। ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ইউএনডিপি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০০৬)। *এসআইসিটি প্রকল্প প্রতিবেদন*। ঢাকা: ইউএনডিপি।

ওইসিডি। (২০১৭)। *বেঞ্চমার্কিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস*। প্যারিস: অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

নিরীক্ষা পর্যায়

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)। (২০০৭)। *ই-গভর্নেন্স হরাইজন স্ক্যান রিপোর্ট: অ্যান অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি অব ই-গভর্নেন্স ইন বাংলাদেশ*। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ইউএনডিপি।

ইউএনডিপি, (২০০৬-২০০৮)। প্রজেক্ট রিভিউ ডকুমেন্টস। ইউএনডিপি

পথপরিক্রমা: বাংলাদেশের ই-গভর্নেন্স

এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)। (২০১০২০২৩)। *এটুআই প্রোগ্রাম রিপোর্টস*। আইসিটি ডিভিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)। (২০১০-২০২৩)। *ব্রডব্যান্ড পলিসি*। বিটিআরসি।

এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই), (এন.ডি.)। *বাংলাদেশ ই-গভর্নেন্স ভিশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি পেপারস*। আইসিটি ডিভিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

রূপান্তরের দৃশ্যকল্প

এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই), (২০২৩)। *এটুআই ইমপ্যাক্ট ইভোল্যুশন রিপোর্ট*। আইসিটি ডিভিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই), (এন.ডি.)। *মাইগভ, ই-ট্যাক্স, ই-মিউটেশন এবং ই-পাসপোর্ট-এর বাস্তবায়ন প্রতিবেদন*। আইসিটি ডিভিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ইউএনডিপি, (এন.ডি.)। *কোলাবোরেটিভ প্রোগ্রাম ডেটা*। ইউএনডিপি।

রূপান্তরের দিগন্তে

দ্য পার্সোনাল গভর্নমেন্ট ডট কম। (এন.ডি.)। *দ্য পার্সোনাল গভর্নমেন্ট ইকোসিস্টেম*।

প্রকাশক

এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)

প্রকাশকাল

২০২৫

ডিসক্লেইমার

‘রূপান্তরের বাংলাদেশ’ গ্রন্থে প্রযুক্তিনির্ভর ই-গভর্ন্যান্স, তথ্যপ্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের কিছু নির্বাচিত উদাহরণ, চিত্র ও বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এই গ্রন্থটি কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার দাবি করে না এবং বাংলাদেশ কিংবা বিশ্বের সব পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন এতে নাও থাকতে পারে। গ্রন্থটির কিছু অংশ সহজলভ্য বিভিন্ন উৎস ও রিসোর্স থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সংকলিত। এ কারণে কিছু তথ্য বা বিষয় অস্পষ্ট, কম বোধগম্য কিংবা অপরিচিত মনে হতে পারে, যা সম্পাদনা পর্ষদের সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এই প্রকাশনার সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো অংশ অনুমতি ছাড়া ব্যবহার, পুনর্মুদ্রণ, পুনরুৎপাদন, বিতরণ, পরিবর্তন বা পরিমার্জন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)

আইসিটি টাওয়ার (লেভেল-১৩), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

+৮৮০ ২-৫৫০০৬৯৩৫ www.a2i.gov.bd

a2iBangladesh a2i-bd a2i_bd a2ibangladesh a2ibangladesh

innovate for all

Cabinet Division

Government of the People's Republic of Bangladesh

ICT DIVISION

FUTURE IS HERE